যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ



বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি: ১২

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ— ১৩৬৭

শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টালাপার্ক
কলিকাতা—২

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য প্রেমিক, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবক হিসাবে সুপরিচিত খ্যাতনামা ব্যক্তি। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে। বয়স তাঁর প্রায় ৮০ অর্থাৎ বাংলাদেশের উজ্জ্বল ইতিহাসের দুইটি শতাব্দী—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও আজ পর্যন্ত সমস্ত বিংশ শতাব্দী তিনি চোখে দেখেছেন। কর্মী হিসাবে এই কালের কর্মের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় রেখেছেন এবং এই সকল বিরাট কর্মের যাঁহারা পুরোধা তাঁহাদের সংস্পর্শেও এসেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে একালের সকলকেই দেখেছেন, বুঝেছেন। সম্প্রতি এই স্মৃতি আলেখ্য তিনি লেখনীর দ্বারা রচনা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশ করতে বেশ-কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে। এ জন্য তিনি বাংলা সরকারের সমীপস্থ হয়েছেন। বাংলা সরকারেরও এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। আমি বাংলা সরকারের নিকট আবেদন জানাব যে, কর্তৃপক্ষ যেন উদার ও অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন, কারণ জাতীয় জীবনের পক্ষে এবং সাহিত্যের পক্ষে দুদিক থেকেই এই গ্রন্থখানির মূল্য অসাধারণ বলে বিবেচিত হবে। ইতি

নিবেদক
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

বাঙ্গলার যদিও আত্মজীবনী এবং জীবনকাহিনী তুইয়েরই একান্ত অভাব, অথচ এ ধরণের সাহিত্যে দেশ ও যুগের ছবি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে চলিত ইতিহাসের মাধ্যমে তা কখনো সম্ভব হয় না। তাই ৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বাঙ্গলার তুইজন প্রবীণ মনীষী স্বর্গত শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন আমার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে যেতেন, পথে তাঁদের মুখে প্রাচীন বহু রাষ্ট্রনেতা ও মনীষীর বিষয়ে তাঁরা নানা কাহিনী বলতেন। তখন আমি তাঁদের বার বার বলেছি যে এসব কথা লিপিবদ্ধ করা সাহিত্যে এবং ইতিহাসের খাতিরে তাঁদের কর্তব্য।

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আমাদের মধ্যে আর নাই কিন্তু সৌভাগ্যবশত শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একাশী বৎসর পুরণ করে শতবাষিকীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে যে সব মনীষী ও চরিত্রবান ব্যক্তির সংসর্গে এসেছেন, তাঁদের কথা সহজ সরল ভাষায় নিজের মতন করে বলেছেন। এ সমস্ত আলোচ্যে তাঁদের কথা তো প্রকাশ হয়েছেই কিন্তু তারচেয়ে বেশী মনোজ্ঞ হয়েছে সেকালের জীবনের ছবি। সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের এ সমারোহ আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সেকালের ছবি প্রকাশিত করবে। আমি জ্যোতিষবাবুর এ প্রচেষ্টার সাদর অভ্যর্থনা জানাই এবং তাঁর রচিত গ্রন্থখানির সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা

হুমায়ুন কবির

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবক, অধুনা অশীতিপর, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নাম বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি বিগত ষাট বৎসর যাবৎ ভারতের বহু খ্যাতিমান মনীষী, রাষ্ট্র-নায়ক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্য-স্রষ্টা, সমাজ-সংস্কারক ও সাংবাদিকদের সংস্পর্শে এসেছেন। বহু গুণিজনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ কথোপকথন ও পত্র-বিনিময় হয়েছে। ফলে যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তা যেমন মূল্যবান তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণে পরিপূর্ণ। এই সাক্ষাতের সাহিত্য পদবাচ্য বিবরণ লেখক এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। লেখকের এই রচনাগুলি পাঠ করলে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি বিরাট অধ্যায় চোখের সম্মুখে যেন ভেসে ওঠে। লেখকের সরল ও তথ্যপূর্ণ রচনায় আলোচ্য ব্যক্তিগণের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। রচনাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্তিকা তিনি বঙ্গসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সংস্পর্শ থেকেই এই ধরণের রচনা জন্মলাভ করে। এই কারণেই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ, এ্যানি বেসান্ত, লেডী অবলা বসু, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ, লর্ড কার্জন, লর্ড কিচনার, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি লেখক কর্তৃক অঙ্কিত চরিত্র-চিত্র পাঠক-পাঠিকার চিত্ত আকর্ষণ করে। উক্ত রচনা-সমূহ মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে।

রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্য বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে—এমন আশা আমরা করতে পারি। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নেই। গবেষকদের মালমশলা গ্রন্থখানিতে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে।

আমাদের জাতীয় সরকারের আনুকূল্য না পাওয়া গেলে, গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

প্রাণতোষ ঘটক

১১১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

সূচী-পত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবানের অপেক্ষা ভক্তই পরম পূজ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস এ যুগের পরমপুরুষ যুগ-অবতাররূপে স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁহারই মন্ত্রপূত ও দীক্ষিত শিষ্য নরেন্দ্রই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়াতে শত শত রামকৃষ্ণ মিশন মঠ, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, শিল্পাগার লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সেবায় বিশ্বজনের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

তাঁহারই ব্রত ছিল, রামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" এই উদারবাণী বিশ্বে প্রচার করা। জাতিধর্ম বিশেষ, ধনী-নির্ধন নির্বিচারে মানব-সেবা করাই নরনারায়ণের পূজা—তিনি মনে করিতেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর কেহ নাই"—কবি চণ্ডীদাসের বাণীই পরম শাশ্বত সত্য। সে জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কোটি কোটি নর-নারীকে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের তথ্য শুনাইয়া মানবের অন্তরনিহিত চেতনা উদ্বুদ্ধ করে ক্ষান্ত হন নাই, মানবশক্তি সঞ্চয়নের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীর নিকট বীরসন্ন্যাসী রূপে পূজ্য। তাঁহারই সাধনায় অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী যুবক-যুবতীরা স্বদেশের মুক্তির জন্য হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, নিদারুণ সর্বপ্রকার পাশবিক অত্যাচার সহিয়াছে। সেই মহাপুরুষের দর্শন ও সংস্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। জীবন সার্থক হইয়াছে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার যে কয়েকজন মহাপুরুষের সংশ্রবে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ, বাঙ্গালীর মধ্যে নরনারায়ণের পূজা, বাঙ্গালীকে উন্নত স্বাধীনতা-

প্রিয় মন গঠনে বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বপ্রধান মহীয়ান ও গরীয়ান নায়ক। সে প্রভাব মদীয় কিশোরমনের উপর পড়িয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের নবভারত গঠনের এবং ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করার যে মহান অবদান তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। বহু বহু জ্ঞানী, গুণী, সাধক, স্বামীজীর বিষয় আলোচনা ও বর্ণিত করিয়াছেন। এখানে একটিমাত্র শুভ অনুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ করিতেছি।

১৯০১ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় বিদেশ হইতে আগমন করেন তখন তাঁহাকে কলিকাতা মহানগরীর নর-নারীগণ বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর বিশাল নন্দলাল বসুর প্রাসাদ অবস্থিত। তাহার সম্মুখে বিশাল ময়দান। প্রাসাদটি খুবই প্রকাণ্ড এবং সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য। বলিতে গেলে কি তদানীন্তন বড়লাটের ভবন। বর্তমান রাজভবন বা Government House এই প্রাসাদের তুলনায় বেশি মহিমান্বিতও নয়। এই নন্দলাল বসুর বাটীতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীপূর্ণিমা প্রভৃতি জাতীয় সভা-সমিতি ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত। প্রায় লক্ষাধিক আকুল ও ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তের নর-নারী সেই বিশাল প্রাঙ্গণে সমবেত। প্রাসাদটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত।

এমন সময়ে চারিঘোড়ায় ঢাকনা খোলা ল্যাণ্ডো (Lando) গাড়িতে সেই আজানুলম্বিত উন্নতবক্ষ পুরুষসিংহ গেরুয়াবস্ত্র-পরা পাগড়িধারী বীরসন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। বিশাল জনতা ভেদ করিয়া সেই ল্যাণ্ডো গাড়ির দিকে দৌড়াইলাম। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। সেই ল্যাণ্ডো জনগণ টানিয়া প্রাঙ্গণ মধ্য দিয়া প্রাসাদমধ্যে লইয়া গেল। এই অবসরে সেই মহাপুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া জন্ম ধন্য করিলাম এবং সেই গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিলাম।

তাহার পর প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া স্বামীজীর উদাত্ত স্বর ও মহাবাণী শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিলাম। বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তাঁর সে মহাবাণী শুনিবার ভাগ্য হইলেও গভীর তথ্য বুঝিবার বুদ্ধি ছিল না। তথাপি তাঁহাকে ছুঁইবার বা তাঁহার গাড়ি টানিবার সৌভাগ্যের কথা এখনও আমার প্রাণে প্রদীপ্তমান।

আমি রেঙ্গুন, কলম্বো, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রাজপুত, ভবানগর প্রভৃতি দূর-দূর দেশে স্বয়ং নিজচক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন মঠ ও হাসপাতালগুলি দেখিয়া আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। যেইখানেই গিয়াছি সেইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা, আশা ও ভরসা সেই দেশের নর-নারীরা কিরূপে পোষণ করে তাহা বুঝিয়াছি। রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের নার্সরা অধিকাংশই কেরন জাতির নারী। কেরনরা খৃশ্চিয়ান এবং বার্মার রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে সে সময় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেরনবাসিনী নার্সদিগের সহিত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও আমি কথাবার্তা কহিয়া জানিলাম, বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই তাঁহারা এই সেবাকার্য করিতেছেন।

শিকাগো পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ান-এ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া ব্রাদার্স এণ্ড সিস্টার্স—ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ বলিয়া সম্বোধন করাতেই আমেরিকাবাসীর মন জয় করিয়াছিলেন। কি অপূর্ব চরিত্র মাধুর্য ও গুরুভক্তির দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ জগৎসভায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী আমরা বাঙ্গালিগণ তাঁহার আবির্ভাবে ধন্য। তাঁহার স্মরণ ও পূজা করাই আমাদের পরম ধর্ম।

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ। বাংলার পুনরুত্থান যুগের ইতিহাস, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। ১৮৬০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একশো বৎসরের মধ্যে সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষায়, ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে, সর্ববিষয়ে একসঙ্গে এত মনীষীর আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ হইতে বিগত ৬০ বৎসরে আমি যে-সকল মনীষিগণের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের কথা এখনও মনে ভাসিতেছে। হয়ত সে সব কথা বিস্মৃতির অতল তলে ভাসিয়া যাইবে। সেই সব বিচিত্র ঘটনা, তথ্য দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে আমার অপরাধ হইবে।

বাল্য-অবস্থায় রাজনৈতিক-চেতনা আমার কোমল মনে অঙ্কুরিত হয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁয়ের সংস্পর্শে আসিয়া। রাজা নরেন্দ্রলাল এক বীর আদিবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ ছিল মেদিনীপুরের নিকট নাড়াজোল পল্লীর সুরক্ষিত গড়ের মধ্যে। তাঁহার শিক্ষা-সংস্কৃতি অতি উচ্চ আদর্শমণ্ডিত এবং উদারভাবাপন্ন ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় মেদিনীপুর ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সদা উৎসবময়। মেদিনীপুরের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেউল, রথযাত্রা উৎসব, জন্মেজয় মল্লিক বংশের রাস ও দোল উৎসব, গঙ্গানারায়ণ দত্তের দুর্গোৎসব, হিন্দু-মুসলমানের মহরমের বীর উৎসব ও তাজিয়া ভাসানোর জাঁকজমক মেদিনীপুর শহরকে বার মাস মুখরিত করিয়া রাখিত।

সে সময় রাজা নরেন্দ্রলালের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা মেদিনীপুর-বাসীর উপর সম্যক বিস্তারিত হইয়াছিল। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নেতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমী অন্তে নবমীর প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে দশভুজার বলিক্ষণ নির্ধারিত

হইত নাড়াজোলের গড় হইতে কামানের ধ্বনি শুনিয়া। মনে পড়ে, এক শারদনিশির স্বচ্ছ নীলাকাশের অগণ্য তারা জ্বলিতেছে—যুক্তকরে সকলে জগন্মাতার স্মরণে নিমগ্ন, হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নাড়াজোলের গড় হইতে কামান গর্জিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে—'মা, মা, মা'! রব আকাশ-বাতাসকে আকুলিত করিল।

জগন্নাথের রথের প্রথম টান ভীমকায় সৌম্যসুন্দর রাজা নরেন্দ্রলাল টানিতেন। মুসলমান ও ঘেসেরিয়াদের আগুন লইয়া খেলিতে খেলিতে, লাঠি, সড়কী, তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লম্প-ঝম্প করিয়া অগ্রসর হইবার সময় রাজা নরেন্দ্রলাল। ' আবার বিবাদ ও মারামারি মিটাইবার সময়ও রাজা নরেন্দ্রলালের ইঙ্গিতে ও মধ্যস্থতায় দক্ষতা সুপরিচালিত হইত।

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ দক্ষ অশ্বারোহী, ওয়েলার অশ্ব (Australian breed) সুনিপুণ চালক। হস্তী আরূঢ় রাজা নরেন্দ্রলালকে দেখিলে পুরাকালের কুরুরাজার বীরত্ব স্মরণ করাইয়া দিত। মেদিনীপুর—মহাভারতে লিখিত বিরাট রাজার গোপগৃহের অধিকারী ছিল।

আমার পিতা স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কসাই নদীর Annicut বা Dam-এর রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনীয়ার এবং মেদিনীপুর ক্যানাল বিভাগের কারখানার কর্তা ছিলেন। এই কারখানা হইতে ডামের মুখ পর্যন্ত নদীর তীর প্রস্তরে বাঁধান ছিল এবং এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ করিবার সুন্দর Promenade ছিল। রাজা নরেন্দ্রলাল প্রায়ই শ্বেত-অশ্বের জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া এখানে পদচারণা করিতে আসিতেন এবং আমার পিতার সহিত সদালাপ করিতেন এবং সান্ধ্যভ্রমণ করিতেন। ক্রমে রাজার সহিত এই পূর্তবিদের গাঢ় সৌহার্দ্য জন্মিয়া যায়। আমি রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আমার বয়স তখন নয়-দশ বৎসর মাত্র। কিন্তু রাজার দেশপ্রীতি, স্বাধীনাকাঙ্ক্ষা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার উগ্র ছবি আমার কিশোর মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ৭৭ বৎসর বয়সেও মনে জাগরিত হইয়া উঠে। নরেন্দ্রলালের বৃটিশ-বিরোধী

মনোভাব ও স্বাধীনতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল, তাহার দু'-একটি উদাহরণ এখনো মনে আছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন বুয়র যুদ্ধ চলিতেছিল, লর্ড রবার্টস, লর্ড কিচেনার প্রমুখ বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষদের অপদস্থ হইবার ও যুদ্ধে হারের কথা শুনিতাম এবং বীর জেনারেল জুবেয়াট প্রমুখ বুয়র সৈন্যাধ্যক্ষদের সফলতার খবর দিনের পর দিন ঘোষিত হইত, তখন বুয়রদের জয়লাভে রাজা নরেন্দ্রলালের কি আনন্দ। হাঁড়ি হাঁড়ি পান্তুয়া বিতরণের কি ধুম। আমাকে লইয়া লোফালুফির পালা চলিত। স্বাধীনতার রস আস্বাদ করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি আমার তখন ছিল না, তবে ইংরাজ-বিরোধিতার মর্ম প্রাণে জাগিয়াছিল।

রাজা নরেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি পরে ইংরাজ রাজপুরুষদের রোষের কারণ হইয়া উঠে। তিনি টেরারিস্ট মুভমেন্টের পিছনে উৎসাহ এবং অর্থ জোগাইতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইতেও হইয়াছিল। তবে ইহাও সত্য, তাঁহারই প্রেরণায় ও উৎসাহে মেদিনীপুরবাসীরা প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছিল এবং স্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিয়াছিল

লর্ড কিচনার

বুয়র যুদ্ধের বিজয়ী বীর জেনারেল লর্ড কিচনার ১৯০৪ সালে ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ক্লাইভ দরজার উপর সুরম্য সৌধে বাস করিতেছিলেন। বুয়র যুদ্ধের প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ স্থলবাহিনীর জেনারেল বীর সেনাপতি লর্ড কিচনার অব খার্টুমেরও নাম শোনা ছিল। ভাবি নাই যে, এই বীরপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইবে।

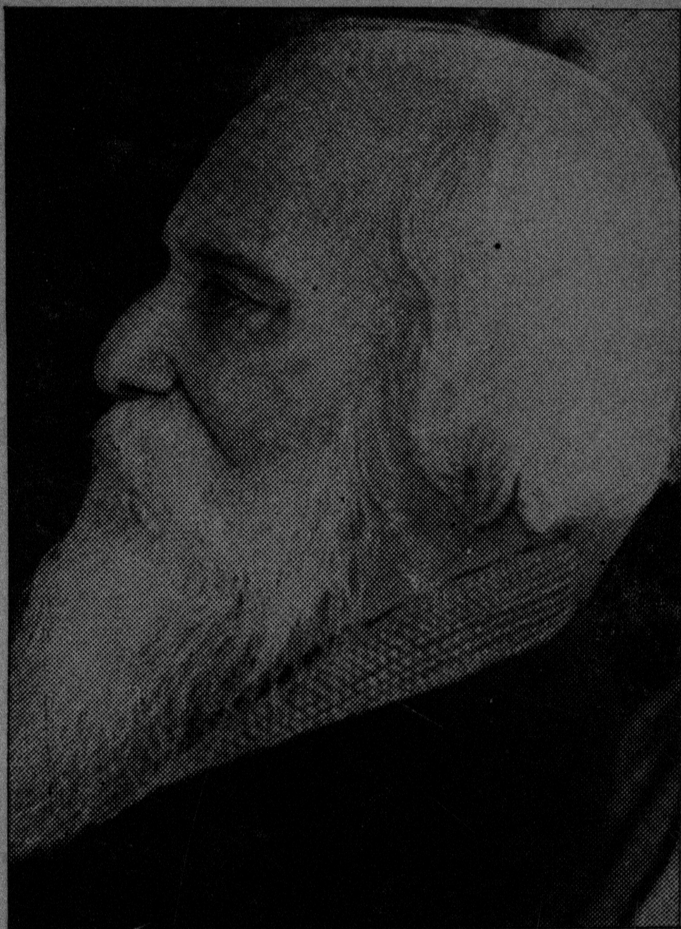
যে-সব মনীষী-সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ মহিমা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে এই সব অধ্যায়ে লেখা হইতেছে। সব রচনার মধ্যে তৎকালীন অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্য ও বিবরণ লিখিতেই হইবে। এইগুলি যদি ভবিষ্যতে বাংলা বা ভারতের ইতিহাস লিখিবার কাজে আসে তাহা হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

১৯০৪ সালে লর্ড কিচনার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে তাঁহার আবাস সংস্কার করাইতে ছিলেন। তাঁহার ভারতের রাজপ্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড কার্জনের পত্নী লেডী কার্জনের কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত বিবাহ প্রস্তাব চলিতেছে। তাঁহার ভাবী-পত্নীর চিত্তবিনোদন ও সন্তোষবিধানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রধান সেনাপতির প্রাসাদটি মনোরম করিয়া পুনর্গঠিত হইতেছিল। সেই সংস্কারকার্যের ভার মদীয় খুল্লতাত হৃদয়নাথ ঘোষ এণ্ড সন্স ঠিকাদারের উপর ন্যস্ত হয়। সেনাপতি কিচনার অতি সুগঠিত, সমুন্নত বীরকায় পুরুষ। তাঁহার কথাবার্তা ও চালচলন যেমন বীরোচিত তেমনই ভীতি উৎপাদক ছিল এবং তাঁহার ইংরাজী বুলিও সহজে বোধগম্য হইবার নয়। সেইজন্য সদ্য এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার পর অবসর সময়ে খুল্লতাতমহাশয় এই দুর্দান্ত বীরপুরুষের সহিত আলোচনা করিবার ও নির্দেশ লইবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন।

তখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি ভারতের প্রধান বৃটিশ শক্তির পরিচায়করূপে কলিকাতার বুকে অবস্থিত। প্রায় শত বৎসর পূর্বে এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বর্তমান জেনারেল পোস্টঅফিস সৌধের স্থানে ছিল। এইখানেই অন্ধকূপহত্যা সম্পাদিত হয়। পিতলের ফলকের দ্বারা সে স্থান চিহ্নিত ছিল, তাহা দেখিয়াছি। বর্তমান দুর্গের গঠনপদ্ধতিও অভিনব। এই দুর্গ মাটির নীচে গভীর পরিখা-বেষ্টিত হইয়া নির্মিত। গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ থাকিত, যে বৃটিশ-রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না সেই বৃটেনের রাজ প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা চারিতলা ডালহাউসি সৈন্য বেরাকের উপর সগর্বে উড্ডীন থাকিত। .একটি উচ্চ গোলাকার স্তম্ভ ছিল। তাহার উপর গোলাকার বল ঠিক মধ্যাহ্ন ১টার সময় কিঞ্চিৎ উঠিয়া শব্দ করিয়া পড়িত। তখনই কেল্লার "র‍্যামপার্ট" হইতে গভীর গর্জনের সহিত তোপধ্বনিতে কলিকাতাবাসীরা শিহরিয়া উঠিত এবং নগরবাসিগণ ঘড়ি মিলাইত। এই কেল্লাটিতে গড়ের মাঠ হইতে ঢুকিবার পথ ও তোরণগুলি ঢালু রাস্তার উপর নির্মিত। তাহারা কলিকাতা, পলাশী, চৌরঙ্গী, ক্লাইভ ও পানি (ওয়াটার) গেট বা দরজা বলিয়া অভিহিত হইত।

যদিও লর্ড কিচনার খুব রূঢ় প্রকৃতির বীরপুরুষ, তথাপি মন কুসুমের মতই কোমল এবং চারু সুকুমার শিল্পের বিশেষ সমঝদার ছিলেন। ইহা বলিলে অবান্তর হয় না যে, ইংরাজ সেনাবাহিনীর বীরপুরুষগণই ভারতের অতীত গৌরব, শিল্প-স্থাপত্যরই উদ্ধারকর্তা, এই সম্বন্ধে জেনারেল ফার্ললুন, জেনারেল কানিংহাম, জেনারেল কিটো, স্যার জন মার্শাল সৈন্যাধ্যক্ষদের নাম চিরস্মরণীয়।

লর্ড কিচনার তাঁহার মধ্যাহ্নভোজের পর প্রতিদিনই তাঁহার প্রাসাদের সংস্কারকার্য পরিদর্শন করিতেন এবং নির্দেশ দিতেন। প্রথম প্রথম ভীতচিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার সরল সদাশয় সুকুমার বৃত্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং প্রকৃত শিল্পীর মত তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি জয়পুরের পাথরের কাজ, অম্বরের ময়ূরের পেখম বিস্তার, আগরার ফুল পাতার সূক্ষ্ম প্রয়োগ অতি নিপুণভাবে দেখাইয়া দিতেন। Art & Architect সম্বন্ধে আমার চেতনা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উন্মীলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারই কৃপায়। তিনিও আমার শিল্পিমনের আদর করিয়াছিলেন এবং একটি প্রশংসাপত্র তাঁহার নিকট হইতে আমার পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

প্রায় তিন মাস তাঁহার সংসর্গে আসিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার এই জঙ্গীশক্তির মধ্যে অনন্ত অসীমের মহিমা অনুভূতি করিবারও ক্ষমতা আছে। ইহার প্রমাণ পাইলাম যখন ১৯৪১ সালে ভারতভূমির শেষ স্থলবিন্দু কন্যা-কুমারিকায় যাই তখন কিচনার রক (Kitchener Rock) বিবেকানন্দ রকের পাশে দেখিলাম এবং Empress নামে তদানীন্তন একটি সচিত্র পত্রিকায় এই কিচনার রকের বিষয় পড়িয়াছিলাম। কিচনার রকটির ও ভারত স্থলবিন্দুর মধ্যে একটি প্রণালীর মতন আছে। সেইখানে স্নান ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পুণ্য কার্য হিন্দু তীর্থযাত্রীরা করে। এখন তার তীরে মহাত্মা গান্ধী স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই মহাত্মাজীর চিতাভস্ম নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

লর্ড কিচনার যখন কন্যা-কুমারিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তিনি বিবেকানন্দ নামে রকটির উপর গিয়াছিলেন। ভারতকূলের দিকে আর একটি রক আছে। এই রকের উপর বসিয়া থাকিতেন। ৬।৭ দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনন্ত অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন। এই তথ্য এম্প্রেস কাগজে পড়িয়াছিলাম জানি না কি ভাবিয়াছিলেন। কি আনন্দ, কি তৃপ্তি পাইতেন।

সেই অবধি ইহা "কিচনার রক" নামে বিখ্যাত, তাই কবির কথা মনে হয়——

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

অধ্যাপক উইন্‌টারনীজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইবার' কয়েক বৎসর পরে তিনি বিশ্বভারতী আশ্রমের বিদ্যাপীঠের জন্য ইউরোপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতগণকে আনিয়া অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সিলভ্যান লেভী ও উইন্‌টারনীজ, স্টেলা কেমরিস, বাকে ছিলেন অন্যতম।

লেখক তখন বিশ্বভারতীর সংসদের সভ্য ছিলেন অর্থাৎ বিশ্বভারতীর পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য। তখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয় ছিলেন প্রধান কর্মসচিব। একদিন সংসদ মিটিং-এর পর অপরাহ্ণ চারটার সময় বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যার্ণব Orientalist (ওরিয়ান্‌টেলিস্ট) উইন্‌টারনীজের সহিত তাঁহার বাসভবন রতন কুটীর-এ দেখা হয়। অধ্যাপক উইন্‌টারনীজ প্রাগ্‌-বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক। তাঁহার বাসায় উন্মুক্ত আকাশ তলে একটি বেদীর উপর বসিয়াছিলেন। প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় দেখা হইবামাত্র বয়সে নবীন এই অপণ্ডিতকে পার্শ্বে বসাইলেন। রতন কুটীর টাটা কোম্পানীর অর্থে নূতন নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নানা কথা হইল। তিনি শিক্ষার্থীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সংযোগসূত্র কোথায়?

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হইয়া এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিবার পূর্বে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভগবৎ কৃপায় উত্তরের সূত্র মিলিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাঁকীপুর শহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মূল সভাপতি এবং ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়—তখনও তিনি মাসে ত্রিশ-চল্লিশ

হাজার টাকা রোজগার করেন—সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় স্বাগত জানান।

সেই সময় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন, তাঁহার বক্তৃতার কথা স্মরণ হওয়ামাত্র অধ্যাপক উইন্‌টারনীজের প্রশ্নের উত্তরের সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম। উত্তর দিলাম যে—দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এক বিখ্যাত দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, মহভারতের শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি—কুটিল রাজনৈতিক নেতা আর মথুরার শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। যদিও ইঁহাদের লীলা পৃথক পৃথক বিভূতিতে বিকাশিত, তথাপি একই সূত্রে কৃষ্ণলীলা সংযোজিত।

এ কথা শুনিয়া অধ্যাপক প্রবর বলিলেন—ঠিক কথা—তবে Where is the connected link ?

উত্তরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের ও মথুরার কৃষ্ণের মধ্যে কবি যে কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা পূর্ণেন্দু সিংহ মহাশয়ের যুক্তি দিয়া উত্তরে কহিলাম—যখন অক্রূর সহিত বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপীজনবল্লভ বংশীধারী ত্রিভঙ্গমুরারি রাধাবল্লভ নৌকা করিয়া যমুনা পার হইয়া মথুরায় যাইতেছিলেন তখন তিনি লীলার ছলে যমুনার জলে পড়িয়া যান এবং বিরহ ও খেদের মধ্যে তিনি বৃন্দাবন বিলাসিনীদের মনোমোহনমূর্তি ত্যাগ করিয়া বীরবেশে যমুনার অপর কূলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে ভাগবতের দক্ষ কবি সূত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন।

অধ্যাপকের চিত্ত পুলকে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল, খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভাগবতের নানা তথ্য জানিতে লাগিলেন এক সরল শিশুর মতন। কুলদা মল্লিক মহাশয় তদানীন্তনকালে সুবক্তা ভগবৎ প্রেমিক লোক ছিলেন—দিনের পর দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিয়া যে সব তথ্য আহরণ করিয়াছিলাম, তাহাই ব্যক্ত করিলাম। কুলদাবাবুর জ্ঞানের ও বিশ্লেষণা পাণ্ডিত্য সবই তদানীন্তন জার্মান দার্শনিকদের অভিজ্ঞতার ফল। পরদিন উপনিষদের উপর আলোচনা চলিল—জ্ঞান অতি সীমিত, অপূর্ণ এমন কি অর্বাচীন—তথাপি এই মহাপণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিতে মন'যেন ক্ষেপিয়া উঠিল।

উপনিষদের ভাষার সম্বন্ধে কুলদা মল্লিক মহাশয়ের মত অবলম্বনে বলিলাম—উপনিষদের প্রাগৈতিহাসিক ছন্দ, ভাষা, তত্ত্ব ও বর্তমান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা হইতে অধিকতর বিশিষ্ট পরিমার্জিত সংক্ষিপ্তও জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। অথচ সকল উপনিষদ কত গভীর সার্বকালীন, সর্বদেশের সার্বভৌম সত্যপূর্ণ। অধ্যাপকবর তখনই আওড়াইলেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদাচ্যতে।
পূর্ণস্য মদয়ে পূর্ণমেবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

তাঁহার পরিষ্কার ও উদাত্ত উচ্চারণধ্বনি এখনও যেন কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে সব জ্ঞানতপস্বীদের সাধনার ফল ভারতে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

———

অ্যানি বেসান্ট

জগদ্বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী, পরমধার্মিক, যোগী, বিখ্যাত থিয়সফিস্ট, স্বাধীনতাকামী, উচ্চাঙ্গ শিক্ষাব্রতী, ভারতবন্ধু মহামান্যা মিসেস অ্যানি বেসান্টের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৯ সালে মেদিনীপুর শহরে। তখন আমার বয়স ১২ বছর, তবু সে স্মৃতি এখনও দেদীপ্যমান। মিসেস বেসান্ট ঠিক এক ঘণ্টাকাল মেদিনীপুর টাউন হলে ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার পর আমার মাতুল (কাশীর চৌখাম্বা নিবাসী ফটিকবাবু)---উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অ্যানি বেসান্টের পিঠে একখানি শাল জড়াইয়া দিলে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বসিলেন—সে দৃশ্য এখনও পঁয়ষট্টি বৎসর পরেও মনের কোণে উদ্ভাসিত। তাহার বক্তৃতা একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই, তবু তাঁহার তেজঃপূর্ণ চক্ষুদ্বয় এবং বাক্যচ্ছটা আমার কর্মজীবন পরিচালিত করিয়াছে।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই আমি তাঁহার স্নেহ পাই। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় যখন আহারে বসি—সেই নিরামিষাশী স্বল্পাহারী আইরিশ মহিলা, আমি পালং শাক ভাজা না খাইয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিতেছি দেখিয়া বলেন—

My dear boy you should eat it ; it provides phosphorus which will keep your brain productive.

সেই কাল অবধি আমি শাক ভক্ষণে খুবই রত।

১৯০৩ সালে কলিকাতায় ২২।২ বৃন্দাবন মল্লিক রাস্তার ও বাদুড়বাগানের মোড়ে আমি আমার বড় মামা নগেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পড়িতাম, তখন মিসেস বেসান্ট তিন দিন এখানেই এক ছোট ঘরে থাকিতেন। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র রেশমী বস্ত্রের শাড়ি গাউনের মতন পরিতেন—শাড়ি ও পুরা হাতার ব্লাউজশুদ্ধ তপস্বিনী দেখিলে মাথা নত তাঁর

চরণেই আপনিই হ'ত। তিনি অন্তর্যামী ছিলেন। পুরাকালের মুনি-ঋষিদের মতন সবজান্তা ও স্থানে মনকে চালনা করাতে পারিতেন।

সেই সময় তিনি স্বয়ং আমায় Initiate করেন, তারপর আমি একনিষ্ঠভাবে Theosophy-র চর্চা অনুশীলন করি। তাঁহার এক প্রধান শিষ্যা Miss Edger-এর নিকট অনেক পাঠ ও Lesson গ্রহণ করি। বহু বৎসর ভবানীপুরের Theosophical Society-র Branch-এর Esotoric Section পঠন ও পাঠ করি। ওখানকার Warden ছিলেন কালিদাস রায়চৌধুরী ও সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক মহাশয় কলিকাতার গিরিশ মিত্র লেনে ও কলেজ স্কোয়ারে Bengal Theosophical Societyতে বছরের পর বছর Esotoric Class-এ পাঠ গ্রহণ করিতাম। যখন মিসেস বেসান্ট কৃষ্ণ-মূর্তিকে অবতাররূপে প্রতিপাদ্য করিতে চান, গান্ধীকে ঐন্দ্রজালিক ধাপ্পাবাজ বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি শিথিল হইতে আরম্ভ করে। তবুও হীরেন্দ্রবাবুর বাগানবাড়িতে যখন মিসেস বেসান্ট থাকিতেন তখনও দিনের পর দিন তাঁহার সেবা করিয়াছি। Col-Olcott, Madam Blavosky ও মিসেস বেসান্ট মনে করিতেন, ভারতে মৈত্রেয়ী নামে এক যুগ-অবতারের আবির্ভাব হইবে। সে ধারণাও আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া জাগে।

সেই সময় শুনিতাম এই আইরিশ মহিলা যিনি বিলাতে Woman Suffrage movement-এর স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন তিনিই Col-Olcott ও Madam Blavosky গানের সহিত সর্ব ধর্মের সারমর্ম (Esotorisim) গ্রহণ করিয়া বিশ্বজনের আধ্যাত্মিক মনোবিকাশ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। আবার তিনিই ভাবিয়াছিলেন বাস্তব জগতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করিলে আত্মিক ও পারমার্থিক উন্নতিমার্গে বিচরণ করিবার সুখ-সুবিধা হয় না। তাই তিনি ভারতে Home Rule Movement আরম্ভ করেন। বাঙ্গলার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রধান সমর্থক ছিলেন।

অ্যানি বেসান্টের প্রধান লীলাক্ষেত্র বেনারসে ছিল কামেচ্ছা পল্লীতে। সেখানে তিনি Theosophical Society of Indian

Section-এর Head Quarterও স্থাপিত করেন এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, বাগ্মিতা ও লেখনী পরিচালনা করেন। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি ছিল অদ্ভুত—ঠিক একঘণ্টার বেশি বলিতেন না, যত ভিন্নমতাবলম্বী হউন বা দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকুন দর্শকগণ একঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। জীবনে বহুবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। ঘোর দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার মধ্যে যখন ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের সভানেত্রীরূপে বক্তৃতা দেন, তাহা যেমন চিত্তে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়াছিল, তেমনই আত্মোৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁর তুল্য ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে সরোজিনী নাইডু ও লালমোহন ঘোষ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি নাই, অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের প্রাণমাতানো বক্তৃতা সকল সময়েই আবাল-বৃদ্ধ যুবক-যুবতীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিত। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বেনারসে তাঁহার লীলাক্ষেত্রে তিনি Central Hindu College ও School, Women College, Hindu Boarding House শান্তিকুঞ্জে (যেখানে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরের উপর বাস করিয়াছিলেন) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্রতে প্রধান সহায়ক মদীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানঋষি ভগবান দাস,—(যিনি পাকিস্থানে ভারতের প্রাক্তন হাই-কমিশনার, ভারতের মন্ত্রী, মাদ্রাজ—বোম্বাই—আসামের গভর্নর ও পরম ভাগবত শ্রীপ্রকাশের পিতা) এই Central Hindu College-ই অধুনা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়। মিসেস বেসান্ট, ভগবান দাস, উপেন্দ্রনাথ বসু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরুতে প্রধান কর্মকর্তা ও পরিচালন সমিতির University Court-এর আজীবন সভ্য ছিলেন।

সমগ্র বিশ্বে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক মহাসভা (Annual Convention) হয় তাহা এক বৎসর মাদ্রাজে, পরবৎসর বেনারসে হইত। অ্যানি বেসান্টের চেষ্টায় তিন বৎসর এইরূপ বিশ্ব পদার্থবিদ্‌দের Theosophical Convention সম্মেলনে যোগদান ও কর্ম করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আজকাল ব্রাহ্ম-

কৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মিশন বা গান্ধী সবরমতী ও ওয়ার্ধা আশ্রমে, অরবিন্দর পণ্ডিচারী আশ্রমে ও শান্তিনিকেতন আশ্রমে বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের নগ্নপদে ভারতের আশ্রমের আচার-ব্যবহারে জীবনযাপন করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত আমরা হই, কিন্তু ইহার পূর্বে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান নরনারীগণ পদার্থ-বিদ্যা শিখিতে আসিয়া মিসেস বেসান্টের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় আচার, আহার ও পোশাক ব্যবহার করিত। আমরা ইহা ১৯০২।৩ সাল হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যখন হোমরুল আন্দোলন কৃতকার্য হইল না, মিসেস বেসান্ট তখন পুনরায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কার্য পূর্ণ উদ্যমে করিতে লাগিলেন। তখন তিনি World's Theosophical Society-র প্রেসিডেন্ট হইলেন এবং আর্ডেয়ার-এ (মাদ্রাজের সহরতলীতে) শান্তির বাগান Garden of Peace গড়িয়া তুলিলেন। সেইখানেই তিনি প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সেখানেও সাংস্কৃতিক, শিল্প, স্থাপত্য ও শিক্ষার বিরাট কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তখন এই বিশ্ব পদার্থ সমিতির World's Theosophical Society-র সহ-সভাপতি হন। সেই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আর্ডেয়ার যাই এবং সেই আশি বৎসর বয়স্কা মহীয়সী মহিলার চরণে প্রণতি জানাই। আমি যে উপেন বসু, নগেন বসুর ভাগ্নে—একথা তখনও তাঁহার স্মরণে ছিল, তেমনই তাঁহার অপার স্নেহলাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও পুণ্য মনে করিতে লাগিলাম।

হে মহিমামণ্ডিতা ভারত ও হিন্দু কল্যাণকামিনী মিসেস অ্যানি বেসান্ট তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

লর্ড কার্জন

বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব যখন সর্বোচ্চে উঠিয়াছিল এবং সমগ্র পৃথিবীতে বৃটিশ শাসন ন্যায়নীতির আদর ও কদর জনপ্রিয় ছিল, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। কুইন ভিক্টোরিয়ার সম্মান ও জনপ্রিয়তা বাল্যকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাঁহার হীরক জুবিলী অনুষ্ঠানের সময়। কলিকাতা মহানগরী আলোকসজ্জায় অপরূপ শ্রী ধারণ করে, ফুঁকো শিশির বা কাঁচের বাল্‌বের মধ্যে নানা রং-এর জল দিয়া তাহাতে রেড়ির তেলের বাতি জ্বালান হইত। অক্টারলোনী মনুমেন্টের ২১০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ সারি সারি বাতির লাল নীল লাইনে অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছিল। গভর্নমেন্ট হাউস, হাইকোর্ট, জেনারেল পোস্ট-অফিস, মিউজিয়াম প্রভৃতি অট্টালিকা গম্বুজ হইতে পোস্তা পর্যন্ত অতি মনোরম দৃশ্যে মহানগরী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের র‍্যামপার্টের ঢালুতে সবুজ রং-এর ঘাসের উপর লাইনবন্দী এই ফুঁকো শিশির আলোক জোনাকীর মত মিট মিট করিতেছিল। কেল্লার দক্ষিণের মাঠে এ্যালেনবরা কোর্সে আতসবাজীর খেলা দেখার আনন্দ সেই বালকচিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া রাখে। নায়েগ্রা ফল্‌স-এর আলোক জলধারা ক্রিস্টাল প্যালেসে ঝিকিমিকি প্রতিকৃতি, হাউই ও রকেটের নানা রং-এর তারা বিচ্ছুরিত ও নানাবিধ পাখীর মত আওয়াজ দেখা ও শোনা এ যুগে কল্পনাতীত বলিয়া মনে হয়, সেদিন ২৪৲ টাকা ভাড়া দিয়া ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়া গড়ের ময়দানে বাজি ও আলো দেখিতে যাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি হইয়া (ভাইসরয় হইয়া) ভারতে পদার্পণ করেন।

এই জুবিলী উৎসব ও তারপর ১৯০২ খৃস্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যখন দিল্লীর দরবার হয় তখন রাজভ্রাতা ডিউক অব কন্টের উপস্থিতিতে লর্ড কার্জন দেশীয় রাজন্যবর্গ লইয়া এক ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ দরবার করেন তাহা ইতিহাসে অতিরমণীয় ও স্মরণীয় উৎসব। তাহারই জের হিসাবে কলিকাতা মহানগরীতে প্রদীপ্ত, ফুঁকো শিশির আলোকসজ্জায় কলিকাতায় সৌধাবলীর মনোহারিণী দৃশ্য ধারণ করে। এই সব সুন্দর পরিকল্পনা লর্ড কার্জনের কৃতিত্ব। ইহাতে লর্ড কার্জনের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাই। তাঁহাকে প্রথমে দেখি—প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখ দিয়া শ্বেতবর্ণের ঘোড়ার খোলা ল্যাণ্ডো গাড়িতে—লাল বেনারসীর রাজ-ছত্রতলে বসিয়া স্নহাস্যে জনগণকে অভিবাদন করিতে করিতে শোভাযাত্রা করিয়া নগরীর Illumination দেখিতে।

এই প্রিয়দর্শন, দাম্ভিক, বাগ্মী, ঐশ্বর্যশালী লর্ড কার্জনই ছিলেন সুকোমল চারু ও কারু শিল্পের উপাসক। ভারতীয় কলা ও স্থাপত্যের পরম অনুরাগী। তিনিই ভারতের অবহেলিত কারু ও চারু শিল্পের সৌধাবলীর উদ্ধার ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ কর্তা। তাঁহারই যত্ন ও উদ্যমে ভারত সরকারের Arcchacological Department প্রবর্তন ও Ancient & Historical Monument Act আইন প্রবর্তিত হয়।

তাঁহার এই কীর্তির এক নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই সময়ই এই পরম প্রতিভাবান লর্ড কার্জনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ও হইয়াছিল তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর—১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে কাশীর উত্তরে বুদ্ধ স্মৃতিবিজড়িত সারনাথের বিশাল ক্ষেত্রে।

তখন সারনাথের (লম্বায় ২ মাইল ও প্রস্থে ৩ মাইল) ৬ বর্গমাইল ভূখণ্ডের এক মাটির ঢিপি। কেবল ধর্মরাজিকা ও চৌখণ্ডী স্তূপ-এর ভগ্নাবশেষ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান—ইহাই নয়নগোচর হয়। এই চৌখণ্ডী স্তূপ এখনও ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় (যদিও সংরক্ষিত) আজ ২৫০০ বৎসরের স্মৃতি লইয়া কালের নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্থানে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার প্রথম ও প্রাজ্ঞ শিষ্যগণের সহিত পুনরায় মিলিত হন। তাহারই উত্তরে সম্রাট

অশোক নির্মিত ধর্মরাজিক স্তুপ ও মূলগন্ধকুটী বিহার। বিশাল বিহার, সংঘারাম ও মূলগন্ধকুটীর সকল প্রাচীন সৌধাবলী এক বিস্তৃত মৃত্তিকার ঢিপির অন্তরে লুপ্ত ছিল। যখন লর্ড কার্জন জেনারেল কানিংহামের নির্দেশে এই বিশাল মাটির ঢিপির উপর প্রথম কোদাল চালাইয়া এই ২৫০০ বৎসরের বৌদ্ধ স্থাপত্য সৌধের, অশোক স্তম্ভের, মূলগন্ধকুটীর স্মৃতি-সৌধাবলীর পরিকল্পনা ও ঐশ্বর্য পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরে আনিবার উদ্যোগ করেন। ভারতের অতীত গৌরব কাহিনীর মর্মবাণী গাহিবার সুযোগ দিয়াছিলেন সেই মহামতি লর্ড কার্জন।

১৯০৪ সালের নভেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জলদীপ্ত উত্তরবায়ু-হিল্লোলিত প্রাতে, উন্মুক্ত গগনতলে মহামতি লর্ড কার্জন এই মাটির ঢিপির উপর কোদাল চালাইয়া অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালীকে অসত্যবাদী বলা, বঙ্গদেশকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালীর জ্ঞানগরিমাকে খর্ব করিবার সকল প্রচেষ্টার অপ্রিয় কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুণ্য কীর্তি তাঁর সকল দোষ আবরিত করিয়া রাখিবে।

লর্ড কীচনারের সহিত আমার পরিচয় আছে শুনিয়া তিনিও সাদরে আমায় আজ্ঞা করিলেন, Young lad you also stuck a spade: আমার চিত্ত পুলকে গৌরবে ভরিয়া উঠিল। যতই ঘৃণা ও বৈরীভাব মনের অন্তরতম প্রদেশে সুপ্ত থাকুক না কেন, এই পুণ্য ও মহৎ কার্যে অহিংসা, তীর্থক্ষেত্র উদ্ধার ও পুণ্যকার্যে হাত দেওয়ায়, লর্ড কার্জনের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়িল। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে সারনাথের ঢিপির উপর লর্ড কার্জনের কোদাল চালানোর ফলে ১৯০৫ সাল হইতেই মেজর কিটোর পরিচালনায় ধামক স্তুপের পাদতলে বিরাট বিহার, চৈত, সংঘারামের কঙ্কাল, ৩০টি মঠ ও ৩০০০ শ্রমণ ভিক্ষুর কক্ষর স্বরূপ স্থাপত্য, শিল্প, ঐশ্বর্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইল।

এই ধামক স্তুপ—ফা হিয়েন ও হিউ সাং দেখিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত লেখকের লিখিত চার পুণ্যস্থান গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ১৯৪৫ সালে যখন হেমলতা ঠাকুরের সহিত ধামক স্তুপের পাদপীঠে বাতি জ্বালাইয়া পরমাত্মভূতিবোধ করি তখন হেমলতা দেবী লিখিলেন—

স্তূপ, ওগো স্মরণীয় স্তূপ,
বাণী কেন নাই মুখে, কেন মৌন চুপ,
রহো কি সমাধিময় হে মহাস্থবির
আনি যত স্তব স্তুতি একান্ত বধির।
কার পুণ্যস্মৃতি চিহ্ন যুগ যুগ ধরি
ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপরি॥

লর্ড কার্জনের কৃপায় সারনাথ ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ হয় এবং তীর্থস্থলকে ভক্তি করিবার অনুপ্রেরণা পাই। প্রায় চল্লিশবারের উপর সারনাথের মূলগন্ধকুটীর সোপানে বসিয়া ধামক স্তূপকে প্রণাম নিবেদন করি—

গন্ধকুটীর গন্ধ ফুল
অর্ঘ্য সাজায়ে কে দিল আনি
ফুটিয়া উঠিল অফুট মুকুল
শুনাল সবারে বুদ্ধ বাণী॥

লর্ড কার্জনকে যে খনন কাজের পত্তন করিতে দেখি, তাহার পাঁচ বৎসর পরে গিয়া দেখি সারনাথ লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রবর্তিত Ancient Monument Preservation Act অনুযায়ী সারনাথ মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ২৪০ খৃঃ পূর্ব হইতে ১১০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশ-বিদেশের শত সহস্র দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিয়া শুনাইতেছে কবির বাণী—

"মমতাময় ছবি তোমারে কোলে লভি
ভূষিত হল ধরা স্বরগ সুষমায়
করুণাসিন্ধু হে ভুবন ইন্দু হে
ভিখারী জগময়ী। প্রণতি তব পায়॥"

—সত্যেন দত্ত।

ব্যক্তিগত হলেও অবান্তর নহে। লর্ড কার্জন কোদাল চালাইতে বলায় এবং মাতুল শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর (ফটিকবাবু) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অ্যানি বেসান্তের সহচর ভাগ্নে বলিয়া পরিচয় পাওয়াতে কাশী নরেশ হিজ হাইনেস প্রভু নারায়ণ সিং মহাশয় স্নেহ করিয়া নদেশ্বরের প্রাসাদে লর্ড ও লেডি কার্জনের

সম্মানার্থে যে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে নিমন্ত্রণ করেন।

পরদিন লর্ড কার্জন যখন কাশী মহারাজের বাত্রিশখানি সুচিত্রিত ময়ূরপংখী বোটে করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার কাশীর ঘাট ও মন্দির দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহাতেও বসিবার অধিকার দেন। এমন কি রামনগর কেল্লায় লর্ড কার্জনের সম্মানার্থে যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করেন তাহাতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম।

এতটা অনুগ্রহ করিবার কারণ কাশীর রাজার সঙ্গে কাশীর চৌখাম্বার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ চেৎ সিংহের সময় হইতে বর্তমান। যখন কাশী নরেশরা রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহার পাগড়ী বাঁধিয়া দিবেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর। লেখক সেই বংশের মোক্ষদা দাস মিত্রের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

কাশীর রাজার খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রাক্ ঐতিহাসিক ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতে নানা শাস্ত্রে, গ্রন্থে ও ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। চেৎ সিং কাশীর শেষ স্বাধীন রাজা। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কাশী সহর ও রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে এক সন্ধির দ্বারা তাঁহার এক বংশধরকে ঐ রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়া বৃটিশরা কাশী রাজ্য স্থাপন করে। কাশীর গঙ্গার অপর তীরে রামনগরে মহারাজা অফ বেনারাসো রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক প্রসিদ্ধ Feudetary State রূপে বিরাজ করিতেছে। রামনগরের প্রাসাদ স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া প্রস্তরের দুর্গশীর্ষে কাশী নরেশের পতাকা উড্ডীয়মান রাখিয়াছিলেন—ভারতে ইংরাজ শাসনের শেষ পর্যন্ত।

সেই দুর্গে কাশী নরেশের নিমন্ত্রণে লর্ড কার্জন ও লেডি কার্জন মধ্যাহ্ন-ভোজনে তৃপ্ত হন। ভোজনান্তে কাশী নরেশের দুর্গের সূক্ষ্ম ও চারুকার্যমণ্ডিত হস্তিদন্তের সামগ্রীর সম্ভার দেখিয়া কার্জনের শিল্পিমন বিস্মিত ও পুলকিত হয়। লেডি কার্জন কাশীর রাজভাণ্ডারে মণিমুক্তা দেখিয়া মুগ্ধ হন। পায়রার ডিমের মত বড় আকারের এক মতির মালার প্রতি তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে, মহারাজ তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সেই বহু মূল্যবান মতির মালাটি লেডি কার্জনকে উপহার

দিলেন এবং লর্ড কার্জনকেও দ্বিরদ রদমণ্ডিত অতুলনীয় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি দ্রব্য উপহার দিয়া রেহাই পান।

এরূপে লর্ড কার্জন বহু রাজা-রাজড়ার নিকট হইতে উপহার সংগ্রহ করার বদনামের মধ্যেও তিনি ফিউডাটোরী চীফদের উপকার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন—কারণ তিনি জানিতেন যে ইঁহাদের দ্বারাই British Imperialism কায়েমী হইবে।

লর্ড কার্জনকে ১৯০৬ সালে এক সভায় বলিতে শুনি যে, যদি তিনি আবার কখনও ভারতে আসেন তাহা হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে আসিবেন ভাইসরয় রূপে নহে। এমনই তিনি কলিকাতাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার কলিকাতা প্রীতি প্রমাণিত হয় কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরিকল্পনা ও ভিত্তিস্থাপন যজ্ঞ সম্পন্নতে। তাঁহার ভারতে Art and Architecture প্রীতি ও তাহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেমন ভারতবাসীর অতীত গৌরব কাহিনীর প্রতি অনুরাগ বাড়াইয়াছে, তেমনই কলিকাতায় তাঁহার স্বপ্ন—ভারতে দ্বিতীয় তাজ নির্মাণ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী রায়

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১২ই অক্টোবর ১৮৬৪ সালে কবি কামিনী রায় বঙ্গজননীর ক্রোড়ে আবির্ভূতা হন। তখন হেম, নবীন, মধুসূদনের যুগ বঙ্গভূমিকে মুখরিত করিয়া চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন চারিদিকে পূর্ণ উজ্জ্বল হয় নাই। তখন কবি কামিনী রায় তাঁহার কাব্যাঞ্জলি বঙ্গমাতার মন্দিরে প্রদান করিতে সুরু করেন।

৪০ বৎসর পূর্বে এই মহীয়সী মহিলার সহিত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁহার কাব্যমহিমার সমালোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু তাঁহার কাব্যসৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৯৪০ সালের ভাদ্রমাসে, ১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মহাপ্রয়াণের পরই বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার ১৯৪০ কার্তিক সংখ্যায় লিখি। তিনি আমাদের ভবানীপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত হাজরা অঞ্চলেই তাঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল। তাই তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা, কাজকর্ম করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাঁহাকে চিনিয়াছি। তাঁহার স্নেহ পাইয়াছি, তাঁহার প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহারই কয়েকটি নিদর্শন দিলে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় এবং তদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের পরিচয় লাভ হয়।

তিনি কথার মূল্য এবং সত্যের মর্যাদা সকল সময় রাখিতেন। একদা বালীগঞ্জ ওয়ার্ড কমিশনারের অন্তর্বর্তী একটি নির্বাচনদ্বন্দ্বে নামিবার আমার অভিপ্রায় হয়। নির্বাচনী প্রস্তাবক পত্রে স্বাক্ষর দিবার জন্য আমি কামিনী দেবীর নিকট যাই, তাঁহাকে বলিবামাত্র বিনা দ্বিধায় স্বাক্ষর দেন এবং তারপর সমর্থক হিসাবে গ্যাস কোং মেনেজার আইরনসাইড রোড নিবাসী মিঃ স্নাডেজের স্বাক্ষর লই এবং মনোনয়ন পত্র দাখিল করি। তারপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয় নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। তখন

কামিনী রায় বলেন, আমি যখন জ্যোতিষবাবুকে কথা দিয়াছি—তখন নিজে গিয়া তাঁহাকেই ভোট দিব—এমনই ছিল তাঁহার সত্যনিষ্ঠা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মহিলাদের স্থান ছিল না, আমারই* চেষ্টায় কামিনী রায় ও অনুরূপা দেবী সভানেত্রী নির্বাচিতা হন। তিনিই প্রথম মহিলা সভানেত্রী হন—সে কি আনন্দ। বলেন, "জ্যোতিষবাবু সত্যই আপনি বঙ্গললনাদের দরদী, তাহাদের মর্যাদাদানে আপনার মন কত উদার।"

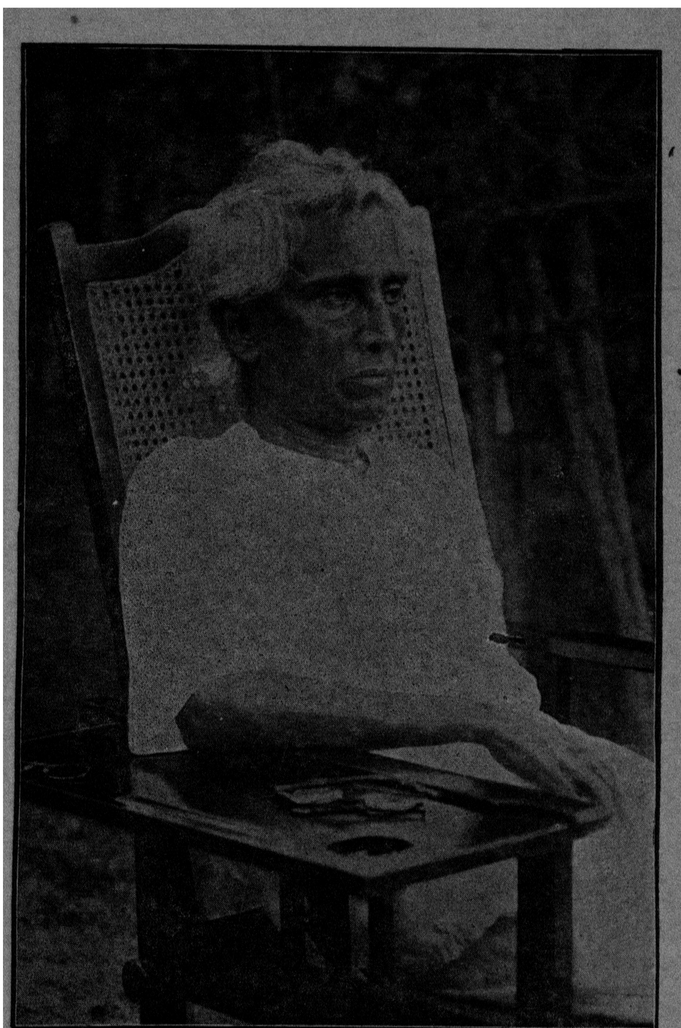
সমাজ-সেবায় তাহার নিদর্শন পাই অনেক স্থলে। তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন তাঁহার শিক্ষাগুরু ও ধর্মদীক্ষাগুরু। ১৮৭০ সালে চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্মে অনুগামী হন, কামিনী রায় মহোদয়াও ব্রাহ্মধর্মে তখন দীক্ষিতা হন। অল্পবয়স কিন্তু তাঁহার পিতার নিকট রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদের ব্যাখ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন উদারভাবসম্পন্না ছিল। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল—মদীয় আলয়ে জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে আসিতেন।

তিনি পিতার ধর্ম সর্বদাই পালন করিতেন। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের অযোধ্যার বেগম, মহারাজ নন্দকুমার, ঝাঁসীর রাণী পুস্তকগুলি কামিনী দেবীর স্বাদেশিকতার উৎস। যখন তিনি তাঁহার পিয়ানোতে স্বরচিত গান—

যেই দিন ওচরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাই আর,
দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমারই কাজে, বাঁচিব তোমারই তরে
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার
থাক প্রাণ যাক প্রাণ, মা আমার, মা আমার।

বাজাইয়া শুনাইতেন তখন তাঁহারও সহিত অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না।

ধর্মভাবের কঠোর বন্ধনে প্রতিপালিত হইলেও, তিনি সমাজে উদারভাবের পরিপোষক ছিলেন। তবে কখনও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দিতেন না। সদাই ঘৃণা করিতেন। তিনি যখন পর্দার বাহিরে আসিতেন বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেন তখন নারীজনশীলতা, সরম কখনও বিসর্জন দেন নাই। আধুনিকা নারীদের উগ্র স্বাধীনতা Ultra modern ভাব দেখিয়া একদা বড়ই ব্যথিত হন। কোন একদিন তাঁহার নিকট যাইলে তিনি বলিলেন—জ্যোতিষবাবু, অসহ্য হয়ে উঠেছে, আজকে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে এমন নির্লিপ্ত ও অশোভনীয় ঢং-এ বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখে মনে বড় ব্যথা পেলাম। তিনি আরো বলিলেন, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে পর্দার বাইরে বার হয়ে নানা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছি কিন্তু তবুও এই বৃদ্ধ-বয়সেও সম্পর্কিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অধোবদন হয়ে থাকি। আমি আই সি এস-এর স্ত্রী, আই সি এস-এর মা, তবু কখনও বেহায়ার মতন রাস্তাঘাটে বার হই না।

যখন কামিনী দেবীকে ১৯২৯ সালে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক সভায় লইয়া যাই, তখন তিনি আর্টের নামে সাহিত্যে যেরূপ দুর্নীতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা মানব মনের ও সমাজের ভীষণ অনিষ্টকর বলিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও অন্য সমাজ ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ আদৌ পছন্দ করিতেন না।

তিনি আমাকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে বলিবামাত্র বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় একটি কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার শেষ কবিতা। তিনি তাঁহার নিজবাটী ৪২।এ, হাজরা রোডেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঠিক একশ' বৎসর পূর্বে এই দিনেও রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। আর তাঁহার স্বামী কেদারনাথ রায় আই সি এস, তিনিও হাজরা রোডের বাটীতে শেষনিঃশ্বাস ফেলেন।

তাঁহার স্বামীর কথা বলিতে গিয়া তিনি হাসিয়া লুটোপুটি হইতেন, কারণ বলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর মত দুর্দান্ত আই সি এস-কে তিনি কবিতা শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন কয়েক বৎসর খুবই মধুময় ছিল বলিয়া তিনি বলিতেন। যদিও তাঁহার পরবর্তী জীবন অতি বিষাদময়। ১৯০৯ সালে তাঁহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু হয়, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের মৃত্যুতে যে ব্যথা পান, তাহা তাঁহার অশোক সঙ্গীত কাব্যে ধ্বনিত

হইয়াছে। ১৯২০ সালে তাঁহার একমাত্র কন্যা তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। তাঁহার এই সকল শোক এতই তীব্র ছিল যে, তিনি আমার কাছে কয়েকবার বলিয়াছিলেন—"জ্যোতিষবাবু, আর তো পারি না, ভগবান কবে নেবেন।"

তাঁহার বেদনায় স্বীয় সন্তানের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণে বেদনা জাগিয়া উঠিত। চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

এত দুঃখ-যাতনার মধ্যেও তিনি দেশের ও দশের কাছে নিষ্ঠায় ও দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য পালন করিতেন। তখন ১৯৩০ সাল ফেব্রুয়ারী মাস, অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ১৩ই মাঘ, উনবিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি, যখন আমি বিবাদ বা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িতাম তখন তিনি দৃঢ়তার সহিত আমায় সমর্থন করিতেন। তিনি বিপিন পাল মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পাঠের প্রতিবাদ সমর্থন করেন।

আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে টাউন হলের সভায় যে স্বর্ণফলকে খোদিত অভিনন্দনটি পাঠ করিবার জন্য শ্রীঅমল হোমের সঙ্গে তাঁহাকে পাঠ করিবার অনুরোধ জানাই, অবশ্য তাহা কবি কামিনী রায়ই পাঠ করেন।

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি কামিনী রায়কে তাঁহার কবিপ্রতিভার জন্য "জগত্তারিণী পদক" ১৯১০ সালে প্রদান করে, তখন সে সংবাদ তাঁহাকে প্রথম আমি জানাই, তিনি আনন্দে এ আমার মত দীনজনকে স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য দিয়া আপ্যায়িত করেন। তাঁহার প্রতিভা ও মমতা বঙ্গনারীর মহিমার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

যে-সব মহীয়সীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনে পুণ্য অর্জন হইয়াছে, তাঁহাদেরই আলোচনা করিতেছি। যতটুকু দেখিয়াছি, যতটুকু লাভ করিয়াছি সেইসব সত্য প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য ইহার সহিত অল্পবিস্তর পারিপার্শ্বিক ঘটনা, তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভাস দিতেছি। ১৯০৪ সাল হইতে নিয়মিত নিজের লেখা ডায়রী স্মৃতিতে ঝালাইয়া লইতে হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমার সাহিত্য-সাধনার গুরুস্থানীয়া। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই পরমাসুন্দরীর জন্ম হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। বহুবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হয়। তাঁহার বিবাহ হয় সৎ হিন্দু প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ সন্তান জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আইনজীবী। ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের প্রথম যুগে বহু বৎসরের জন্য সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইলেও জানকীনাথ ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতেন না, ঘরজামাইও থাকেন নাই।

আমার জন্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর ভবানীপুর অঞ্চলে ৩৬, পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে ১৮৮৭ খৃঃ, যে বাড়ি এখনও অপরিবর্তিত আছে। এই অঞ্চলের অনতিদূরে ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বাস করিতেন। সে সৌধ তখন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাগানবাড়ির অতিথি আলয় ছিল। এই বাগানবাড়ির মধ্যেই সুরম্যহর্ম্যে বিখ্যাত ADAM & EVE-এর তৈলচিত্র ছিল। এ বাগানের মধ্য দিয়া ১৯০৮ সালে রিচি রোড নির্মিত হইয়াছে। এখন পূর্ব অংশে St. Lowrence School এবং পশ্চিম অংশে স্বর্ণকুমারী থাকিতেন। তাহার নবরূপ

রূপায়িত হইয়াছে 'উদয়ন' নামে কানাইলাল দত্তর (হিমানী সাবান নির্মাতা) কুঠী।

স্বর্ণকুমারীর এক পুত্র স্যার জ্যোৎস্না ঘোষাল আই সি এস অন্য দুইটি কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ছিলেন। ইঁহাদের বিষয় পরে বলিব। জ্যোৎস্না ঘোষালের বিবাহ হয় কুচবিহারের মহারাণী—কেশব সেন দুহিতা—সুনীতি দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা (Princess Prety) রাজকুমারী প্রীতির সহিত ১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতার ঐ বাড়ি হইতেই। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। বর, আমাদের বাটীর সম্মুখে পদ্মপুকুর রোড দিয়া উডল্যাণ্ড প্রাসাদে যাইবে। ল্যান্সডাউন রোড তখন হয় নাই। অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বরকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কেল্লার হাইল্যাণ্ডর ব্যাকপাইপ ও আইরিশ গোরার বাদ্যসহ গ্যাস লাইট নামে এক প্রকার আলোয় পদ্মপুকুর রোড আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আট ঘোড়ার গাড়ি—যাকে, Postilian Drive বলে। ইংরাজ কোচম্যান এক এক আট ঘোড়ার গাড়ি উজ্জ্বল জরির পোষাক পরিহিত হইয়া—চালাইয়া যাইতেছিল। বিরাট রাজছত্রতলে রাজপুত্রের ন্যায় পুলতি জ্যোৎস্না ঘোষাল বরের সাজে সজ্জিত। হুইল চাকার পার্শ্বে পুরা জঙ্গী পোষাকে পুলিশ অফিসার ও শ্বেত অশ্বোপরি বরের শরীররক্ষীরূপে চলিলেন। আগুপিছু বৃটিশ অশ্বারোহী এবং শিখ বর্ষাধারী অশ্বারোহীর দল। মাঝে মাঝে গোরার বাদ্য মিলিটারী ব্যাণ্ড চলিতেছিল। খাসগেলাসের বাঁধা রোশনাই ঝিকমিক আলো জোনাকীর মত খেলিতেছিল। ৪ মাইল পথে লোক আর ধরে না।

এই দৃশ্য যখন মনে তোলপাড় করিত, ঠিক সেই সময় একদিন এক ট্রাইসাইকেলে চড়িয়া গেঞ্জি গায়ে সাদা হাফ প্যাণ্ট পরিয়া বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়া ভাইসরয়ের বডিগার্ড লাইনের ঘোড়া-দৌড়ের সহিত যাইতেছিলাম। সে রাস্তা সে মাঠ এখনও আছে, কেবল পুরান বডিগার্ড লাইন সেই স্মৃতি মুছিয়া নূতন মিলিটারী ছাউনী হইয়াছে। বড় বড় Anti Air-Craft Gun বসিয়াছে। সেইদিন হঠাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রাতর্ভ্রমণে বাধা দিয়া বসিলাম। সেই সৌম্যমূর্তি কোন কোপ প্রদর্শন করিলেন না, পিঠ চাপড়াইয়া মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় থাক?

নিকটে থাকি জানিয়া তাঁহার বংশের সৌন্দর্য-প্রিয়তার জন্য আদর করিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন। এইখানে তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের সঙ্গী প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার টি পালিতকে বিদায় দিলেন।

ট্রাইসাইকেল চালাইয়া তাঁহার সহিত প্রাঙ্গণে ঢুকিলাম। পিয়ানোর টুং-টুং শব্দ শুনিয়া সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িলাম— তদপেক্ষা মধুর স্বর শুনিলাম সরি। ও সরি দেখ কেমন একটি সুন্দর ছেলে ধরে এনেছি। সে মিষ্টি কথাগুলি এই তিন কুড়ি বছর পরেও আমার কানে যেন ঝঙ্কৃত হয়।

প্রত্যুত্তরে যে কর্কশ বাক্য শুনিয়াছিলাম—কি করব? সেও আমার বেশ স্মরণ আছে। তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা স্বনামধন্যা সরলা দেবী। তাঁহার প্রতি সেদিন যে ভয় ও বিকৃত মনোভাব জাগে—পরবর্তীকালে অনেক আত্মীয়তা, স্নেহ সহযোগেও তাহা মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

তারপর হইতে কয়েক বৎসর স্বর্ণকুমারী দেবীর সকাশে যাতায়াত করিয়াছি এবং বালিগঞ্জের বাবু বৃন্দাবনের রসাস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছি। নূতন ও পুরাতন বালিগঞ্জ, সানী পার্ক, চেস্টার রোডে, লালকুঠীতে, চৌধুরীর সাত ভাই—জজ স্যার এ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জামাতা—জে চৌধুরী, শিকারী কে এন চৌধুরী, সত্যেন ঠাকুর ও তৎপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কন্যা ইন্দিরা দেবী, সর্বোপরি বসন্তের কোকিলের ন্যায় আসেন রবীন্দ্রনাথ—এই বাবু বৃন্দাবনে মধুর রসলহরী বহিত।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও আশু চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় বাবু বৃন্দাবনের একটি বৈঠকে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাই। সেটি ছিল সারস্বত সম্মেলন—এক বাসন্তী পঞ্চমীর দিন। এ রসকুঞ্জে প্রধান প্রধান মধুকর ছিলেন—মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, প্রমথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন, ইন্দিরা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতিও রসান যোগাইতে ছাড়েন নাই। গানের পর গান, কবিতার পর কবিতা, হাস্য, পরিহাস চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিহাসপূর্ণ বকুনির তুবড়ি ছুড়িয়া মাতাইয়া রাখিতেছেন। এমন সময় সমবেত সুধিবৃন্দ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—এবার রবি-কবির গান হউক।

কবি বলিয়া উঠিলেন—

যদি পরাণ না চায়, আর গাহিব না গান
নীরব হউক তব বীণার তান।

অনেকক্ষণ অনুরোধ করার পর কবি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি যদি বাজাও ও মহারাজ যদি পাখোয়াজে তাল দেন তবে কবি গান গাহিবে।

তখনই ইন্দিরা দেবী বাজানো শুরু করিলেন, আর নাটোর মহারাজ পাখোয়াজে চাঁটি দিলেন—সভা গমগমিয়া উঠিল—

যদি বারণ কর তব গাহিব না গান
যদি সরম লাগে তবে আর চাহিব না।

পূর্বেই জানাইয়াছি স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম আমাকে লিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং এ-বিষয়ে তিনিই আমার গুরু। স্বর্ণকুমারী দেবী যখন ভারতী পত্রিকার ২য় পর্যায় চালাইতেছিলেন তখন মণি গাঙ্গুলী সেই গোষ্ঠীতে ছিলেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, এ ছেলেটিকে তোমাদের দলে ভিড়িয়ে নাও।

মণিবাবু বলিলেন, এ যে একেবারে ননী, আমার মা আমায় ননীর পুতুল বলিতেন, সেই থেকেই আমার ডাকনাম ননী চলিত ছিল।

স্বর্ণকুমারীকে প্রথম দর্শনে এই নাম বলি এবং তিনি এই নামই ব্যবহার করিতেন। মণিবাবুর কথায় আমি লজ্জিত হইলাম, স্থির করিলাম বাংলা চর্চা করিব না। তখন স্কুল-কলেজে এমন কি ঘরে ঘরেও বাংলা চর্চা বিশেষ ছিল না। লেখার কথা উঠিলেই পালাইয়া পালাইয়া বেড়াইতাম। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী হাল ছাড়িলেন না।

একদিন মহামতি কবীরের একখানি ইংরাজী জীবনী দিলেন এবং বলিলেন, ইহার অনুবাদ করে আনো। একটি কট্‌মট অনুবাদ করিয়া লইয়া গেলাম, ধৈর্যসহকারে পড়িয়া লেখাটির আত্মোপান্ত কাটিয়া-ছাঁটিয়া দিলেন। হুকুম করিলেন, কালই আবার কাগজে কেবল একদিনের পৃষ্ঠায় লিখে আনো। তাহার পরই দেখিলাম সেই মহামতি কবীর ভারতী পত্রিকার ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত

ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলিতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবী আমার বাংলা লেখার গুরু।

তাহার পর ৫৫ বৎসর তাঁহার স্নেহচ্ছায়াতলে বসিয়া অনেক কিছু করিতে পারিয়াছি। তাহার দুই একটি স্মৃতিকাহিনী এখানে উল্লেখ করিব। একদিন বালিগঞ্জের ৫৭নং বাড়ির সামনে রেলিং-কাজ পরিদর্শন করিতেছিলাম—সিনেট হাউসের উত্তর দিকের রেলিং ভাঙ্গিয়া আনিয়া উহা এই বাড়িতে বসান হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ভারতের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনের প্রাসাদ এনে তুমি আমার নৈবেদ্য সাজিয়েছ। হায়! সেই স্মরণীয় বরণীয় বিদ্যামন্দির—সেনেট হাউসের বিলুপ্তি ঘটিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জিদে। বিলোপসাধনে কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না, ভাঙ্গিতে হাত কাঁপিল না। প্রাণে ব্যথা লাগিল না। সিনেট হাউস রক্ষার দাবী জানাইতে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবাদ করিল না। সিনেট হাউসের ভিতর দিয়া না যাইলে ৪০ বৎসর আমার ভাত হজম হইত না, সেই অঞ্চলে এখন যাইলে প্রাণে একটা বেদনা অনুভব করি।

একদিন সকালবেলায় তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়াছি—দেখি, দীন-দুঃখীর সমব্যথী শরৎ পণ্ডিত বা দাদাঠাকুর উপস্থিত। সেই মহীয়সী মহিলা তখন আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। কোলকাতাটা ভুলে ভরা বার বার শুনে হাসিতে ডুবিয়া গেলেন।

নদী নাইকো জোড়াসাঁকো
তাই সেখানে হয় দিনেরাতে রবির উদয়।

আমাদের দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ তৈরি করিলেন Recitation, Registration, Regignation, Portion, Petition, Agitation ইত্যাদি।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমায় বলিলেন জ্যোৎস্না এ্যালফ্যান্সো আম কাল পাঠিয়েছে। পণ্ডিত ভোজন করাও। পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল স্বর্ণকুমারী দেবী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাকে এ্যালফ্যান্সো আম বোম্বাই হইতে পাঠাইতেন। তখন তিনি বোম্বাই এবং পুণার, রত্নগিরি জেলার জজ ছিলেন, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি

হইয়াছিলেন। আমার সৌভাগ্য হইত প্রতি বছরে ২।৩ বার এই এ্যালফ্যান্সো আম স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট পাইতাম। যতদিন স্বর্ণকুমারী দেবী বাঁচিয়াছিলেন, এই প্রসাদ পাইয়াছি।

আর একটি তাঁর দান পাইবার সৌভাগ্য হইত। আমার পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে ১৯২৪ সাল হইতে এখনও পর্যন্ত জগদ্ধাত্রী পূজা বছরে বছরে হইয়া আসিতেছে। যদিও স্বর্ণকুমারী দেবী আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাণস্বরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা তথাপি তাঁহার মনে মূর্তি-পূজার প্রতি বিরুদ্ধভাব ছিল না। সেইজন্য তিনি আমার বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আসিতেন। নারিকেল নাড়ু ও রসবড়া খাইয়া তৃপ্তির মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম বছর হইতে তাঁহার সানি পার্কের বাগান থেকে আশ্বিন মাসে ৫০টি ঝুনা নারিকেল পাঠাইয়া দিতেন। টি পালিত মহাশয়ের সরকার হরিপদবাবু বাড়ি বহিয়া নারিকেল দিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর স্যার জ্যোৎস্না ঘোষাল মহাশয়ও কয়েক বছর নারিকেল পাঠাইয়াছিলেন। এ দান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা। ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৩ই মাঘ ঊনবিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসিলেন না। অধিবেশনের মাত্র চারদিন পূর্বে পূজ্যপাদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট তাঁহার সভাপতির অভিভাষণটি পাঠাইয়া তাঁহাকে উহা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। ছুটিয়া গেলাম স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট। বলিলাম, রবীন্দ্রনাথের স্থান আপনি ছাড়া আর কেহ পূরণ করিতে পারে না, বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমার কথা এড়ান দায়।

তিনি রাতারাতি সাহিত্যে নারীর অবদান বৈদিক যুগ হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত—সুললিত ভাষায় লিখিয়া দিলেন। তাঁহাকে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থন করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অনুমোদন করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ইহাতে তিনি বিনয়ের সহিত বলেন যে, আপনারা যে

এবং কত অনুপযুক্তাকে আসনে বসাইলেন তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন, এক খঞ্জ, এক জরাগ্রস্ত ও এক অন্ধ দ্বারা মনোনীত হইয়াছি—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যখন রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত অভিভাষণ পাঠের আপত্তি করিয়া অভ্যর্থনা সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ওজস্বিনী বাগ্মিতা ও দৃঢ় কণ্ঠের সহিত আপত্তি করিলেন, সভায় তখন তুমুল বিক্ষোভ উঠিল। এই মহীয়সী মহিলা সে-সময় তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, রবির ভাষণ পাঠ নিশ্চয় হইবে।

এইরূপে বারে বারে স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিতেন। তিনি বাংলা নবজাগরণের যুগে সর্ব অগ্রবর্তিনী ছিলেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্য সাধনারও অগ্রণী মহিলা লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের প্রখর তাপে প্রভাবান্বিত না হইলেও তাঁহার আওতায় সাহিত্য ক্ষেত্রে পূর্ণ বিকাশ পায় নাই।

ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে নারী-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল তাহারই তরঙ্গমালা কলিকাতা ও বাংলা দেশ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সর্ব ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই তরঙ্গমালার ঢেউ-এ স্বর্ণকুমারী ভাসিয়া উঠেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বিদুষী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। ১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৩ ৫ হইতে ২১ বৎসর পর্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। তিনি উপন্যাস, কবিতা, গল্প, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার প্রমাণ সুবৃহৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী পাঠে পাওয়া যায়। তাঁহার এই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বামীর সহিত তিনিও থিয়োজফিতে বিশ্বাসী হন। তিনি বাংলা দেশের থিয়োজফিকেল সোসাইটির মহিলা শাখার সভানেত্রী ছিলেন, যখন ইহা উঠিয়া যায়, তখন ১৮৮৬ সালে সুখী সমিতি নামে এক মহিলা সমিতি সংগঠন করেন—সেখানে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিতে ও স্বাবলম্বিনী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত।

ভিন্ন ভিন্ন জেলা ও গ্রাম হইতে হস্তশিল্প সংগ্রহ—এক একটি মেলার অনুষ্ঠান করিতেন।

তাঁহার স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল খাঁটি কংগ্রেসসেবী, স্বর্ণকুমারীও তাঁহার অনুগামিনী ছিলেন। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম নারী-প্রতিনিধি রূপে এবং ১৮৯০ সালে কলিকাতা অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও কংগ্রেসে যোগদান করেন। এমনই মহীয়সী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এত মহান, এত বিরাট, এত প্রতিভাবান যে তাঁর বিষয় কিছু বলা ও লেখা ধৃষ্টতা। তাঁহার বিষয় বহু গুণী, মহা মহা পণ্ডিত নানাভাবে লিখিয়াছেন। অগুণতি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমিও "বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ", "মহামানব সাগরতীরে", বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় ১২ মাসে ১২টি অধ্যায়ে রবীন্দ্র-জীবনী কথা প্রকাশ করিয়াছি।

তথাপি তাঁহার প্রতিভা ও জীবন এমনিই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাহা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার কথা যত স্মরণ করা যায় ততই মঙ্গল ও পুণ্য।

রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে প্রায় অর্ধশতাব্দী আসিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি ১৯০২ সালে যখন বিডন স্কোয়ারে (অধুনা রবীন্দ্র উদ্যান নামে খ্যাত) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মিঃ দীনশা ইদুলসী ওয়াচা সভাপতি, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মিঃ জে ঘোষাল সম্পাদক ছিলেন। জানকীনাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী। তিনি সেই অধিবেশনে গান গাহিয়া মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

তাঁহার কণ্ঠধ্বনি, সৌম্য সহাস্য আনন, আজানুলম্বিত বাহু, সুপারিপাট্য কৌশিক পরিচ্ছদ আমার বালক হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার সন্নিকটে আসিবার সৌভাগ্য হয়।

১৯০৫ সালে বিদেশী শাসকগণ লর্ড কার্জনের উদ্যোগে বাংলা দেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করে। বাঙ্গালীর দেশপ্রীতি, স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতে ধ্বনিত হইল। তাঁহাদের কণ্ঠে বাঙ্গলা দেশের আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল। সেই সব গান কবি-কণ্ঠে শুনিয়া আকুলিত হইতাম।

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য, বাঙ্গালী জাতিকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য, সংক্রান্তি তিথি, পুণ্যতোয়া গঙ্গাস্নান, উপবাস, রাখীবন্ধন ব্রত পালিত হয়।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের পুরোভাগে আসিলেন।

কলিকাতার জ্ঞানীগুণিগণ সহ গঙ্গাস্নানান্তে নগ্নপদে ঘাট হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত, "বাঙলার মাটি বাঙ্গলার জল পুণ্য হউক" গাহিতে গাহিতে, হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ সকলের হাতে রবীন্দ্রনাথ রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন।

সেই সঙ্গে আমিও রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগিলাম। এমন কি, আস্তাবলে, অশ্বশালায় গিয়া সহিস, কোচম্যানের হাতে রাখীবন্ধন চলিল। সেদিন রবীন্দ্রনাথের যে রক্তিম-উজ্জ্বল আনন ও তেজদীপ্ত মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও চিত্তে ভাসিয়া উঠে।

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সার্থক করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ "শান্তির মাঠে"—(অধুনা যেখানে কলিকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে) এক মহতী সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি প্রবল অনুরাগী হই। তাহার পর শত শত বার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি,—তাহারই কয়েকটি ঘটনা ও বিবরণে তাঁহার ঘরোয়া মনোভাব বিকাশ পাইবে।

১

এক বসন্ত-পঞ্চমীতে বালিগঞ্জে সানি পার্কে সারস্বত সম্মেলন হয়। তখন হরিপুরের দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সাত পুত্র এক কন্যা নিভৃত বালিগঞ্জ অঞ্চলকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তখন "নবরন্দাবন" বলিয়া এই অঞ্চল খ্যাত ছিল।

আশুতোষ চৌধুরী (ঠাকুরবাড়ির জামাতা, প্রতিভা দেবীর স্বামী), শ্রীযোগেশ চৌধুরী (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা), কে, এন, চৌধুরী (ডব্লু, সি, ব্যানার্জির জামাতা), ডাঃ এস, এন, চৌধুরী (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাতজামাই), এম, এন, চৌধুরী, পি, চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা),

প্রসন্নময়ী দেবী (কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা) আর তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন ঠাকুর, (থাকিতেন গুরুসদয় রোডে, যেখানে বিড়লা মিউজিয়ম অবস্থিত) এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তখনও হাইকোর্টের জজ হন নাই। ইনি সৌজন্যের অবতার, উদার প্রাণ, সৌখীনতার আদর্শ ছিলেন।

আশুতোষ-গৃহে, সেই সারস্বত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। তাঁহার কণ্ঠে গান শুনিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। বিনয়সুলভ প্রকৃতিতে তিনি কিছুতেই গান গাহিতে সম্মত হন না। যখন ইন্দিরা দেবী বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ইন্দিরা দেবী ও মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোরাধিপতি) যদি পিয়ানো ও পাখোয়াজ বাজান তাহা হইলে তিনি গাহিবেন।

শ্রোতাদের মধ্যে তাঁহার প্রধান সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ছিলেন। হর্ষধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"যদি বারণ কর তবে গাহিব না
যদি সরম লাগে চোখে চাহিব না"।

আসর জমিয়া উঠিল। তিনি পরপর ক'য়েকখানি গান গাহিলেন। সারস্বত সম্মেলন চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

২

ইংরাজী ৬ই জুলাই ১৯২৯ সাল (২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া স্টেশনে যাই ও তাঁহাকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করি। বিপুল জনসমাগম, তার মধ্যে প্রধানত ছিলেন—অধ্যাপক পি, সি, মহলানবীশ, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ প্রমথ চৌধুরী, মিঃ এস, এন, ঠাকুর। কলিকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রীটের ভবনে ৪ দিন অবস্থান করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে যান।

তারপরই বিশ্বভারতীর সংসদের সভার অধিবেশনে যোগ দিতে যাই। অপরাহ্নে মাঠে ফটো তোলা হয়। সে সময় আমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। ফটো তুলিতে বিলম্ব হইতেছে, রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমাদের দেশের ফটো তোলান যেন নবমী পূজার পাঁঠা বলির মতন, বাবা! কাটিবে ত' এককোপ বসাও, তা না মুণ্ডু পা টেনে প্রাণটা—মত।" বলিলেন, "জাপানে এ আপদ নাই, কখন যে লুকিয়ে ফটো তুলিল টেরই পাওয়া যায় না।"

—জাপানে তোলা সেই সময়ের একটি ফটো আমি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম। সে ফটো 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে ছাপিয়াছি। সেই ফটোতে রবীন্দ্রনাথের জামার স্লীভে Tokyo লেখা আছে।

সেই সময় আমি বলি—"আপনার ত' অনেক ফটো আছে"—উত্তরে কবি বলেন—"আকাশে যত তারা তত", আমি বলি—"আপনার বিভিন্ন বয়সের ফটো যদি দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়", তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন—"কেন জেয়ান্ত মানুষটা লইয়া আর বুঝি চলছে না?" বড়ই লজ্জা পাই। তবু বলিলেন, "আমার ফটো লইয়া কি হইবে?" আমি বলিলাম, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখিব।"

• তার ১৫।২০ দিন বাদে হঠাৎ দেখি গুরুদেবের একান্ত সচিব শ্রীঅনিল চন্দ মহাশয় ১৭ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরে তোলা ফটো লইয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে কবির নিজ অঙ্কিত এক নারীমূর্তি এবং কবির ব্যবহৃত লাঠি উপহার দিলেন।

সেই ফটোগুলি দু'দিকে কাঁচ দিয়া বাঁধাইয়া 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে' রাখিয়া দিয়াছি। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া এক সুদৃশ্য আধারে "রবীন্দ্র সংগ্রহ" স্থাপন করি। এখন তাহা সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তার পার্শ্বেই আচার্য পি, সি, রায় সংগ্রহ স্থাপনা পরিষদ মন্দিরে করিয়াছি।

৩

কবির আত্মমর্যাদা জ্ঞান অপরূপ। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি যখন শান্তিনিকেতনে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয়

লর্ড আরউইন ও লেডী আরউইন গমন করেন। সেই প্রথম ইংরেজ শাসনকর্তা শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। কবি স্বয়ং আরউইন-দম্পতির অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করেন—এবং নিজেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার ভার যথাযোগ্য ব্যক্তির উপর প্রদান করেন।

নিজে কোন অংশগ্রহণ করিলেন না,—কেবল রাজপ্রতিনিধিগণকে 'উত্তরায়ণে' চা পানের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

Irwin দম্পতি সানন্দে শান্তিনিকেতনের দেহলী, শ্রীভবন, আম্রকুঞ্জে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সমাগম, ছাতিমতলা, কলাভবন, লাইব্রেরী-গৃহ পরিদর্শন করিলেন, কিন্তু কবিকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে যাইতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, "Is the poet well ?" উত্তরে বলিলাম, "He is waiting to meet you in tea table".

ইহার পর দৌড়াইয়া কবিকে খবর দিলাম, তিনি তখন উত্তরায়ণের উপরতলায় বসিয়াছিলেন, বলিলেন—"চল, নীচে যাই, তোমাদের লাট-দম্পতিকে চা পান করাইয়া দিই।"

নীচে নামিয়া সিঁড়ির উপরের চাতালে দাঁড়াইলেন। লাট-দম্পতির গাড়ি সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইল। তখনও কবি অচল অটল। আমি ছুটিয়া গিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিলাম। নিজাম, গাইকয়াড়, গোয়ালিয়র, ট্রাভাঙ্কোরের অধিপতিগণ হইলেও ছুটিয়া দরজা খুলিয়া অভ্যর্থনা করি কিন্তু কবি একেবারে উদাসীন।

দরজা খোলার পর ধীরে ধীরে কবি অগ্রসর হইয়া, বাঁ পা সিঁড়ির ধাপে রাখিয়া ডান পা আগাইয়া করমর্দনপূর্বক উপরে লইয়া আসিলেন। এবং আদর ও মধুর ভাষণে লাট-দম্পতির মন জয় করিলেন। পরে এই দৃশ্যের তাৎপর্য কি একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "তোমরা কি চাও তোমাদের কবি পথে বসে? তা হ'লে তোমাদের কবির মর্যাদা কোথায় থাকে? পথের কবি কি ক'রে অতবড় লোকের সম্মান দিবে।"

এমনই ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা জ্ঞান।

৪

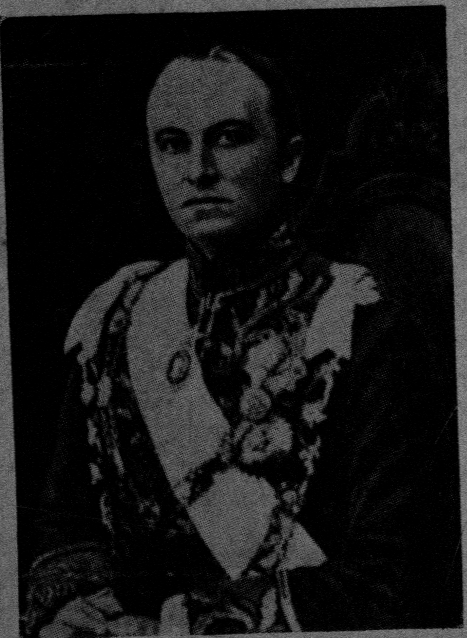
একদা শান্তিনিকেতনে সংসদ মিটিং-এর পর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছি। পাশে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—সম্মুখে যতীন বসু পি, চৌধুরী, ডাঃ শিশির মিত্র মহাশয়গণ আহারে রত।

আশ্রমবাসিনীগণ চামচে করিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। আমাদের জঠর জ্বলিতেছে—অথচ চাহিয়া লইতে লজ্জা করিতেছে—আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইবে। নীরবে ক্ষুধা দমন করিতেছি,—এমন সময় দরবেশ পরিবেশিত হইল। তখন শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির খাদ্য পারিপাট্যের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

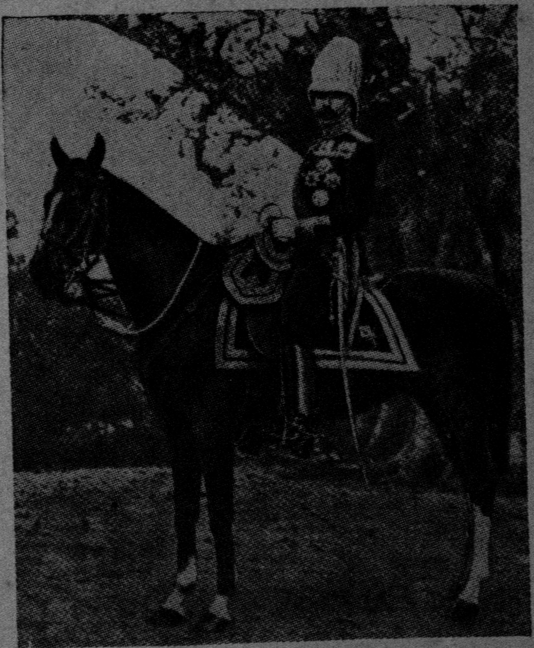
তাই ঘরে তৈরি গাওয়া ঘিয়ে, পেস্তা, বাদাম, ক্ষীর, জাফরান দিয়ে প্রস্তুত দরবেশ অতি সুস্বাদু ছিল। চারুবাবুকে তাহা উল্লেখ করায় তিনি লজ্জার মাথা খাইয়া একটি দরবেশ আমায় দিতে বলিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ বলি, "আমি চাই নাই, চারুবাবু চাহিতেছেন।" তখন চারুবাবুর পাতেও পড়িল। চারুবাবু আমায় দিতে বলায় আর একটি দরবেশ আমায় দিল। এমনি করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। যখন ৩১টি খাওয়া হইয়াছে, তখন আমি কিছুতেই আর লইলাম না। চারুবাবু আরও একটি খাইলেন—অর্থাৎ বত্রিশটি। খুব হাসিখুসী উত্তেজনা চলিল।

এ বার্তা গুরুদেবের কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় কবি Baldwin-কে (কবির একান্ত সচিব শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর টাক মাথার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী Mr. Baldwin-এর নামে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন) আমাদের অবস্থা চুপি চুপি দেখিয়া আসিতে বলেন। তিনি আসিয়া দেখেন চারুবাবু গুরুভোজের জন্য রাত্রে জলস্পর্শ না করিয়া শাল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। আর আমি ভোজনশালায় আহারে রত। সুধাকান্তবাবু সে কথা কবিকে বলেন।

পরদিন প্রাতে গুরুদেব স্বয়ং গেস্ট হাউসের দ্বিতলে উঠিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন। আমরা তখন শীতের শয্যায় আরাম করিতেছি। কবি সহাস্য বদনে বলিলেন—"ও চারুবাবু, আপনি বামুনের ছেলে হ'য়ে কায়েতের কাছে হেরে গেলেন।"



লর্ড কার্জন (১৯০৪)



লর্ড কিচনার (১৯০৪)

চারু সগর্বে বলিয়া উঠিলেন—"না তার আমি বত্রিশটা, আর উনি একত্রিশটা"—গুরুদেব উচ্চ হাসিয়া বলিলেন—"তারপর আমি কুপোকাৎ, উনি বাজীমাৎ।"

তারপর চেয়ারে বসিয়া অতিভোজনের অনেক গল্প করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কে কবে একটা গোটা ছাগ-শিশুর মাংস, দু' হাঁড়ি দই, ৪০টি রসগোল্লা খাইয়াছিলেন। দিনে ৪ বার পুরা নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়া আহার করিয়াও সোজা হইয়া চলিতেন। খাইয়া হজম করাই কৃতিত্ব ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন আহার করিতে ভালবাসিতেন, তেমনই খাওয়াইতেও আনন্দ পাইতেন।

কেহ ভাল খাইতে পারিলে আনন্দ পাইতেন।

৫

১৯৪০ খৃস্টাব্দে হেমলতা দেবীর (বড়মার) সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা সহ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে, কবির সহিত জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা'য় দেখা করি। তিনি আগ্রহের সহিত মহাবলীপুরামের 'পঞ্চপাণ্ডব রথ' নামে খ্যাত এক একটি শৈল কর্তন করিয়া স্থাপত্য সৌন্দর্য, পাহাড়ের গায়ে ইন্দ্রর তপস্যা খোদিত দৃশ্য, সমুদ্রগর্ভ সপ্ত মন্দিরের অবশিষ্টটির শিল্প-স্থাপত্যয় 'মহিষাসুরমর্দিনী বহুবলধারিণী'র বর্ণনা শুনিতে শুনিতে আমাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"তোমরা ধন্য, বাস্তবিক তীর্থ-ভ্রমণ করেছ। আমি অবনের কথায় দু'বার মহাবলীপুরামের ধার ঘেঁসে গিয়েও আমার সে মহীয়ান শিল্পসম্ভার দেখিবার ভাগ্য হইল না।" এমনই ছিল কবির শিল্প-সাধনার প্রতি অনুরাগ।

৬

২০শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে কবির সহিত শেষ ঘরে শেষ দর্শন। ডাক্তার ও পারিষদগণের কড়া নিষেধে বহুবার কবির সান্নিধ্যে যাওয়ার চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়াছি।

তখন বড়মার শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বলিলেন, "আমাদেরও সেই পরিতাপ। কাকা মহাশয় ভাল হ'য়ে উঠলেই ভাল।"

হঠাৎ ভোরে টেলিফোন পাইলাম—"যদি কাকা মহাশয়কে দেখিতে চান, এখনই চলে আসুন। ৯টার সময় আমরা দর্শন করিতে যাইব।"

ছুটিলাম শেষ ঘরের দিকে, 'বড়মা'ও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পশ্চাতে পশ্চাতে অতি সন্তর্পণে ও ভীতসঙ্কুচিত চিত্তে। মেয়েরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্পন্দনহীন হইয়া পশ্চিমের বারান্দায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কবিকে বারবার দর্শন করিতে লাগিলাম। একবার কবির নজরে পড়ি,—কবি হাতছানি দিয়া কাছে আসিতে ডাকিলেন। ধীরে, ভয়ে বেদনার্তচিত্তে পদতলে গেলাম। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"সাহিত্য-পরিষদ! (আমায় অনেক সময় এই নামে ডাকিতেন) তুমিও যে দেখছি বেড়া ডিঙ্গাইতে পেরেছ।" সে কথা শুনিয়া আর চক্ষের জল চাপিতে পারিলাম না। শেষ করুণ দৃশ্য। সে পুণ্যস্মৃতি চিরস্মরণীয়। এমনই ছিল তাঁহার আত্মজনের প্রতি মমতা।

২২শে শ্রাবণ তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের খবর পাইয়া যখন ঠাকুরবাড়িতে ছুটিলাম, তখন লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছে। অবন-গগন ঠাকুরের বাড়ির (দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ির) গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়া মহাকবির মহাপ্রয়াণের শেষ শোভাযাত্রা দেখি ও কবিকে জানাই আমার শেষ প্রণাম।

—

সরলা দেবী

সরলা দেবী স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষাল এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন হিরণ্ময়ী মুখার্জী। সরলা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, তাঁহার জন্ম ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে—সেই আঁতুড়ঘরে যেখানে ররীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন।

আমার বয়স যখন ১২।১৩ তখন একদিন স্বর্ণকুমারী দেবী ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে আমাকে লইয়া সরলা দেবীর সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও প্রথম আলাপ মধুর না হইলেও পরে অতি ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

সরলা দেবী বুদ্ধিমতী ও ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, যে-সময় বাংলার সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কেবল নিষিদ্ধ নয়, পাপ বলিয়া গণ্য হইত, সে অন্ধকার-যুগে ১৩ বৎসর বয়সে সরলা দেবী এনট্রান্স পাশ করেন। ১৮৮৬ সালে ১৭ বৎসর বয়সে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান এমনই প্রখর ছিল যে বাল্যকাল হইতে বাঙালী জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। সে-বিষয় জীবনে "ঝরাপাতা নামক" আত্ম-জীবনীতে সরলা দেবী লিখেছেন—

"বাঙালী জাতির সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল, এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিল ১০।১২ বছর পরে কিপলিং-এর একখানা ছোট গল্পের বই-এ—একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অপমানিত করার কথা পড়িবার পর। তার প্রতিবিধানকল্পে আমি দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলাম এবং আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম।"

সেই স্বদেশপ্রীতি অনুপ্রেরণাতে সরলা দেবী কলিকাতায় ১৯০৩ সালে প্রতাপাদিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত করেন এবং ১৯০৪ সালে বাঙলার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার

জন্য বীরাষ্টমী ব্রত পালন করেন। সরলা দেবীর সহিত এই দুই উৎসবে যোগ দিবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। প্রথম দর্শনে তাঁহার নিকট ভয়ে ভয়ে যাইতাম। কিন্তু তিনি বীরোচিত মর্যাদায় আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন এবং খুবই স্নেহ দেখাইতেন। তাঁর পিতৃগৃহে মার্তুজা নামে এক বীরের নিকট আমাদের ছোরা ও তরবারী চালান শিখিতে হইয়াছে। এই সময় তিনি ভারতী পত্রিকায় "বিলাতি ঘুসি বনাম দেশী কিল" লিখিয়া বাঙলাতে বিদেশ ও গোরাদের হাতে অপমানের শোধ লইবার উৎসাহ দেন।

এই সব অনুষ্ঠান ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁহার মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হইত। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়ির দক্ষিণেই এই বাড়ি অবস্থিত। সেইজন্য এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সুবিধা ছিল। সন্ধ্যার পর একটি মণ্ডপের প্রান্তে প্রতাপাদিত্যের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ তরবারী চুম্বন করিতে বলা হইত এবং ছোরা, লাঠি, তরবারী, কুস্তি ও বক্সিং খেলায় সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেন। সে কি উদ্দীপনা তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

তিনি একটি ছাত্র ও বয়স্কদের লইয়া দল গঠন করেন। সেই দলভুক্ত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

এই প্রতাপাদিত্য উৎসবে সরলা দেবী আমাদের সামনে একখানি ভারতের মানচিত্র রাখিতেন। সেটিকে প্রণাম করিবার আদেশ দিতেন এবং তনু-মন দিয়া ভারতের সেবা করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেন। তিনি এই দলের সভ্যদের ও সেবকদের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিতেন। এই অনুষ্ঠান অবশ্য বেশিদিন টিকে নাই। কিন্তু তখন সমস্ত বাঙলায় এক দেশপ্রীতির চেতনা চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

As necessity is the mother of invention, so Sarala Devi is the mother of Protapaditya Utsab to meet the necessity of a hero worship for Bengal.

—Young India.

সরলা দেবী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীত ও বাদ্যতে পরম নিপুণা ছিলেন। তিনি দক্ষ পিয়ানোবাদক ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য

সুরকে সামঞ্জস্য করিয়া নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সব গান তাঁহার 'শতগান' নামে সংগ্রহ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯০১ সালে স্যার দীন্‌শা ওয়াচা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিডন উদ্যানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে সরলা দেবীকে গাহিতে শুনিয়াছিলাম—

'অতীত গৌরববাহিনী মমবাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান'।

তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর। সরলা দেবীর রূপ ও লাবণ্য শ্রীমণ্ডিত দেবীমূর্তি দেখিয়া এবং তাঁহার প্রাণ-উন্মাদিনী গান শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম। সে স্মৃতি চিত্তে এখনও জাগরিত আছে।

একদা মদীয় গৃহে রবিবাসরীয় অধিবেশনে সরলা দেবী মহোদয়া আমার কন্যা রমাকে লইয়া ঐ "অতীত গৌরববাহিনী" গানটি চড়া সুরে গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া—

আপনার কন্যাকে ভাল করিয়া গান শিখান—সে ভাল গান করিতে পারিবে।

তাঁহার সে আশীর্বাদ রমার শ্রেষ্ঠ পুঁজি। ইহা ১৯৪৪ সালের ঘটনা। তাহারই এক বৎসর পরে সরলা দেবী আলিপুরের ৮নং নিউ রোডের ভবনে পরলোকগমন করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র দীপক দত্তচৌধুরী, বার-এট-ল, তাঁহার মরদেহের পাশেই সরলা দেবীর গান ও প্রবন্ধগুলি ছাপাইতে এবং তাহা প্রচার করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায় সে-কার্য সম্পন্ন হয় নাই, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা।

সরলা দেবীর সঙ্গীতে কেবল দখল ছিল না, তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বেশ জানা ছিল। কুমিল্লাতে ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত-শাখা সভানেত্রীরূপে তাঁহাকে যখন স্টীমারে লইয়া যাইতেছিলাম তখন তিনি চাঁদপুর যাইবার পথে স্টীমারের ডেকে বসিয়া গান গাহিয়া গানের প্রতিশব্দ ইথারে কেমন স্পন্দন (Vibration) কিরূপ পরিগ্রহ করে তাহা বুঝাইয়া দেন। সে আলোচনার সময়

শ্রী ও সি গাঙ্গুলী, ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি (এই সম্মেলনের মূল সভাপতি), ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বেনারসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহার সভাপতি হন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়। এ বছরই তিনি বলেন—"What Bengal thinks to-day, rest of India do that to morrow".

সেখানে সরলা দেবীকে মহামতি গোখলে "বন্দেমাতরম" গানটি গাহিতে বলেন—সরলা দেবী মধুরকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে 'সপ্তকোটি' শব্দকে চট্ করে 'ত্রিংশকোটি' করিয়া গাহিলেন এবং সকলের কণ্ঠে এমনই মধু ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাতেই ভারতের সকল প্রান্তের প্রতিনিধিগণ বন্দেমাতরমই জাতীয়-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। 'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুর সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথেরই অনুরোধে যোজনা করেন। তাঁহারই কাছে শুনিয়াছিলাম প্রথম দুই লাইনের সুর রবীন্দ্রনাথ নিজেই বসাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯০৫ সালেই সরলা দেবীর সহিত পাঞ্জাবের রামভুজ দত্তচৌধুরীর বিবাহ হয়। পাঞ্জাব ও বাঙলার ভাগ্য যে একসূত্রে বাঁধা, পরে তাহা ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চণ্ডীগড়ে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন করিতে গিয়া সম্যক উপলব্ধি করি। এই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হওয়াতে পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার ডাঃ যোশীর নিকট বাঙলা ভাষা শিখানোর জন্য অনুরোধ করায় তিনি তখনই ব্যবস্থা করেন। সেইজন্য তাহার আগ্রহে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার পুস্তকের একটি সংগ্রহশালা স্থাপনা ও বার্ষিক ১০০৲ টাকা বাঙলা শিক্ষা উৎসাহের জন্য বৃত্তির এণ্ডাউমেণ্ট নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির পক্ষে করিয়া দিয়া আসি।

সরলা দেবী ও রামভুজ দত্তচৌধুরীর পরিণয়ের ফলে 'লাল-বাল-পাল' এই তিন রাজনৈতিক নেতাদের কার্য প্রখর হইয়া উঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের রহস্য সরলা দেবীই গোপনপত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানাইয়াছিলেন। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথ স্যার উপাধি ত্যাগ করিয়া অমর হইয়াছেন। সরলা দেবীও চিরধন্যা।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

মাননীয়বর শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখেল মহাশয় ১৮৬৬ সালের ৯ই মে মহারাষ্ট্র প্রদেশের রত্নগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণরাও গোখেল অতি গরীব ছিলেন। বাল্যকালেই গোপালকৃষ্ণ তাঁহার পিতাকে হারান। তাঁহার বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি বি-এ পাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডে গিয়া আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, এমন কি আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতি করিয়া বিত্তশালী হইবার ইচ্ছা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

তিনি নানা অসুবিধার মধ্যে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার প্রতিভা উন্মেষিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলক, চীপলঙ্কার, অধ্যাপক আগরকার প্রমুখ দেশপ্রেমী কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭০ সালে জাস্টিস মহাদেব গোবিন্দ রানাডে যে সার্বজনীন সভা স্থাপিত করেন, উত্তরকালে গোপালকৃষ্ণ ইহার সম্পাদক হিসাবে এই সভায় যোগদান করেন। মহামতি রানাডের নিকট তিনি সরকারী রাজকর, প্রশাসন নিয়ম এবং বাজেট প্রণয়ন শিক্ষা করেন। তাই তিনি বলিতেন শ্রীযুক্ত রানাডে আমার রাজনৈতিক গুরু (My Political Guru) এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেই সময় তিনি বক্তৃতা দেন, ইহাই তাঁহার প্রাথমিক বক্তৃতা (Maiden speech in Congress) তখন হইতে তিনি কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান সেবক হইয়া ওঠেন। ১৮৯৬ সালে পুণাতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, তিনি তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৯৭ সালে Welby Commission গঠিত হয় তাহাতে তিনি সাক্ষ্য দেন। তিনি (১) স্বরাষ্ট্র-দপ্তরে, আইন-বিচার বিভাগে, (২) অর্থ বিলিব্যবস্থা

বাজেট প্রণয়নে, (৩) কৃষি-সেচ-পূর্ত বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবী করেন।

১৯০০ সালে মিঃ গোখেল প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য এবং ১৯০২ সালে স্যার ফিরোজ সা মেটার পদত্যাগের পর ভাইসরয়ের Executive Council-এর সভ্য হন। ১৯১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি Executive Council-এর সভ্য থাকিয়া বাজেট আলোচনায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এমনই তাঁহার যুক্তি ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল যে, তদানীন্তন দাম্ভিক, সুদক্ষ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাজেট আলোচনায় Council-এর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গোখেল অসুস্থতার জন্য যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া অধিবেশন স্থগিত রাখিয়াছিলেন। ইহাতেই লর্ড কার্জনের যেমন গুণীর আদরের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি গোখেলের তীক্ষ্ণবুদ্ধির খ্যাতি দেখা যায়।

১৮৯৬ সাল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর প্রবল অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক মনোভাবের পরিচয় প্রকট হইয়া ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রোজগারের খুব অসুবিধা দেখা দেয়। গোখেল মহাশয় তখন আফ্রিকায় গিয়াছিলেন এবং বৃটিশ রাজের নাগরিক অধিকার পাইবার জন্য দাবী করেন। তাঁহার যুক্তিতর্ক মানিয়া লইয়া প্রিটোরিয়ার মন্ত্রিবর্গ Per Capita Tax ধার্য রহিত করিয়া দেন।

গোখেল মহাশয়েরই প্রেরণায় মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী ভারত হইতে ব্যারিস্টারী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালান। গোপালকৃষ্ণ মহাশয় করমচাঁদকে ৩০,০০০৲ টাকা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেন।

১৯১৩ সালে মিঃ গান্ধী বলিয়াছিলেন—"Mr. Gokhale inspired me to launch the Satyagraha and hence I consider him as my political Guru".

গান্ধীজী গোপালকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা দেখাইয়া "Gokhale the good" বলিতে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম।

১৮৯৬ সালে গোখেলের সহিত প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করিয়া ১৯২১ সালে Young Indiaতে ১৩ই জুলাই লিখিয়াছিলেন—

"He was and remains for me the most perfect man on the political field. Every word of Gokhale glowed with his tender feeling. Truthfulness and patrisim. I believed he had the capacity to mount the gallows for the country's shake—if necessary. Discipleship is a sacred personal matter. It could not be trifled with."

১৯০৯ সালে গোখেল গান্ধীজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,

"He (M. K. Gandhi) is a man who may well be described as a man among men, a hero among heroes, a patriot among patriots and we may well say that, in him, Indian humanity at the present time has really reached its high water mark".

শ্রীযুক্ত গোখেল মহাশয় তখন গান্ধীজীর সাউথ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ব্রত পালন স্বচক্ষে দেখেন নাই। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া গোখেল মহাশয় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে এতই আকৃষ্ট হন যে, তিনি তাঁহাকে স্বদেশের মুক্তি আন্দোলন চালাইবার জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। গোখেলের মৃত্যুর পরই ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং একবৎসর মৌন থাকিয়া মহাত্মাজী তাঁহার গুরু গোখেলের আদেশ পালন করেন ও চম্পারণ, খেদা ও আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ চালাইয়া মহাত্মা নামে অভিহিত হন। ১৯০৫ সালে গোখেলজী রাজনৈতিক মিশন লইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ইংলণ্ডবাসীদের হৃদয়ে ভারতের দুঃখ-দৈন্যের কথা অবহিত করান। তাহার পরে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর। আমার বয়স তখন ১৯ বৎসর—আমিও উক্ত কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। স্বকর্ণে গোখেল মহাশয়কে বলিতে শুনি যে, "What Bengal thinks to-day, rest of India will do that to-morrow". কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন মিটাইয়া না দিলে সারা ভারতে দারুণ বিক্ষুব্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

১৯০২ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভাইসরয়ের Executive Council-এর সভ্য হিসাবে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইত এবং কলিকাতায় বসবাস করিতেন। এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন এবং বহু বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত জি, কে, গোখেল মহাশয়ের সহিত আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে ভবানীপুর পোড়বাজার-এ (যেখানে কলিকাতার গঙ্গাজল সরবরাহের Pumping Station ছিল, অধুনা যেখানে Alexander Court ও Calcutta Club অবস্থিত) জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নারোজী—তখন গোখেল মহাশয় ৪নং রোল্যাণ্ড রোডে বাস করিতেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গোখেল মহাশয়কে সেবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁহার স্নেহ ও অনুগ্রহ পাইবার সৌভাগ্য হয়। তিনি মিষ্টভাষী, স্নেহশীল, দীপ্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি; এই মনীষী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

কংগ্রেসের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যাইবার পরও আমাকে তাঁহার বাড়িতে যাইবার জন্য বহুবার ডাকিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ি আমার বাড়ি হইতে কয়েক ফার্লং দূর মাত্র, তাঁহার বাড়িতেই আমি প্রথম শ্রী এম, কে, গান্ধীকে দেখি। গান্ধীজী গোখেলজীকে কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা উপলব্ধি করি। গোখেল মহাশয়ও গান্ধীজীকে খুব স্নেহ করিতেন। `০৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে, "Gandhiji is a purer, a nobler, a braver and a more exalted spirit has never moved on this earth."

আমরা বাঙ্গলার অধিবাসিগণ গোপালকৃষ্ণ গোখেলের বাঙ্গলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অতি সম্মানের সহিত সকল সময়েই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি। আমার হৃদয়ে এক স্মৃতিকণা উদয় হইতেছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পি কে রায় শ্রীযুক্ত গোখেলের

পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শ্রীমতী সরলা রায় (মিসেস পি কে রায়) যখন ভারতের মহিলাদের সুশিক্ষার জন্য বিশেষত পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় দক্ষ করিবার নিমিত্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে যান, তখন তিনি স্কুলের নামকরণের সময় মহাত্মা গোখেলের নাম অনুসারে স্কুলের নাম রাখেন। এই আলোচনার সময় আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম—আমারই কন্যা স্বর্গীয়া নিশারাণীকে লইয়া তিনি প্রথম দিন অন্নদা ব্যানার্জী লেনে স্কুল স্থাপন করেন।

শ্রী জি কে গোখেল মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইতেছে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলাম। মহারাষ্ট্র নিবাসের কর্তৃপক্ষ ও বাঙ্গলার গোখেল অনুরাগিগণের নিকট অনুরোধ যে, কলিকাতা ময়দানে মহামতি তিলকের ন্যায় শ্রীগোখেলেরও যেন একটি মূর্তি স্থাপনা করেন।



মদনমোহন মালব্য

বৃটিশ শাসনের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে-সব মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহাদের মধ্যে একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি আর্যধর্ম, হিন্দু ঐতিহ্যের মর্যাদারক্ষ ধারক ও বাহক ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা না হইলে জাতির বিকাশ হয় না, মানবতার স্ফুরণ হয় না।

সেইজন্যই তিনি ভারতের নিজস্ব ধারায় শিক্ষাপ্রদানের নানাবিধ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। নওগায় কাশীধামের সংলগ্ন গঙ্গাতীরে পল্লীতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার প্রধান কীর্তি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ১৯৩১ সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট বেনারসে থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর ভারতীয় শাখার প্রধান কর্ত্রীরূপে কামেচ্ছায় মনোরম আশ্রম ও শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে তিনি মেয়ে-পুরুষগণকে প্রকৃত আর্য-সভ্যতার আদর্শে একটি মহিলা বিদ্যালয় ও অপরটি Central Hindu College শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে কাশী নরেশ হিজ হাইনেস মহারাজা প্রভুদয়াল সিং-এর প্রস্তরের মণ্ডপ প্রাসাদ ও ভূমি পাইয়া তদানীন্তন কলেজ পত্তন করেন। এবং এই শিক্ষাগারগুলিকে একত্রে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইংরাজ সরকারের বা বিদেশী কোনপ্রকার সাহায্য বা প্রভাব ব্যতীত স্বাধীন শাশ্বত চিন্তাধারায় এই মহাবিদ্যালয় গঠনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়ান চৌধাহ্বার উপেন্দ্রনাথ বসু ও মহা পণ্ডিত ভগবান দাস।

যখন মিসেস বেসান্টকে অন্য ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মযোগ সাধনে চিত্ত-নিয়োগ করিতে হইল তখন এই হিন্দু আদর্শ শিক্ষাপীঠটির গঠনভার মদনমোহন মালব্য লইলেন। বিদেশী সরকারের নিকট অর্থসাহায্য না লইয়া হিন্দুর সনাতন শিক্ষার আদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিকাশ করিলেন। ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারস্থ হইলেন।

প্রগতিশীল বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়
করিলেন। গাইকোয়াড় গ্রন্থশালার বিরাট হর্ম্য নির্মাণ হইল।

এই গ্রন্থালয়ে ভারতীয় রাজা মহারাজা ও পণ্ডিতগণের চিত্র স্থাপিত হইল। ১৯৪৫ সালে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখাইতে লইয়া গেলাম। তিনি বরোদা লাইব্রেরীর পুস্তক, পুঁথি, মুদ্রা ও নানা প্রদেশের কলার সংগ্রহ বিভাগ দেখিয়া যেমন পুলকিত হইলেন, তেমনই বাঙ্গলার কোন মনীষীর এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও চিত্র ও বাঙ্গলা পুস্তকের সংগ্রহ না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন।

তখন সবে মিঃ পি চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ফরাসী পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন। তাহা দুর্গাদাস চৌধুরী বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের 'বেণীধাম' গৃহে বড়মা ছিলেন।

তিনি এ বিষয়ে মদনমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমায় বলিলেন। পরদিনই মালব্যজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম—তিনি এ ত্রুটির জন্য লজ্জিত হইলেন।

তখন রবীন্দ্রনাথের একখানি চিত্র ও বাঙ্গলা পুস্তকের একটি সংগ্রহ প্রদানের প্রস্তাব করিলাম। আমি উপেন্দ্রনাথ বসুর ভাগিনেয় জানিয়া আমার এ প্রস্তাব মালব্যজী সাদরে অনুমোদন করিলেন।

সেই সময় কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর কর্ণধার শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় রবীন্দ্রনাথের চিত্র দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহাকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বরোদা লাইব্রেরীতে রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একখানি তৈলচিত্র দান করিতে অনুরোধ করি। তিনি সানন্দে রবীন্দ্রনাথের একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র প্রদানের সঙ্কল্প লইলেন।

আমার ঠাকুরবাড়ির সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকায় রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর এবং দর্মাহাটার ঠাকুরবাটীর লেখকদের অনেক পুস্তক তাঁহাদের উৎসর্গলিপি ও স্বাক্ষরসহ ছেলেবেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

সেই অমূল্য সংগ্রহটি Tagore family Writers Collection নাম দিয়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বরোদা লাইব্রেরীতে প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

মালব্যজী আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান অভাব মোচন করিলে।"

বড়মাও খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া Tagor family writers-টির জন্য ঠাকুরবাড়ির ছেলে, মেয়ে, বৌ, জামাইদের পুস্তক উপহার জোগাড় করিতে লাগিলেন। Calcutta Art Society-র সম্পাদক প্রণবেশ সিংহের অক্লান্ত চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কৌচেবসা একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রস্তুত হইল। আর ঠাকুরপরিবারের নিকট হইতে প্রাপ্ত মদীয় সংগ্রহের ১৪০ একশত চল্লিশটি ও হেমলতা দেবীর চেষ্টায় ১০০ পুস্তক সংগৃহীত হইল। চিত্র ও পুস্তক সংগ্রহটি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদানের প্রস্তাব পাঠাই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ স্থাপনের দিন স্থির হইল।

মাননীয় স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সে সময়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। স্যার রাধাকৃষ্ণণ মালব্যজীর অনুমোদনে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠার দিন বার্ষিক কনভোকেশনের দিনই স্থির করিলেন। তখন আলিগড়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও নব প্রতিষ্ঠিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তিনটিই ভারত সরকারের অধীনে অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটীর পক্ষে প্রণবেশ সিংহ এবং বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির পক্ষে স্বয়ং এবং মদীয় কনিষ্ঠা কন্যা রমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

এই দিনটি মদনমোহন মালব্যর জন্মদিবসের পূর্বদিন। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার মীর্জা ইসমাইল মহাশয় সমাবর্তন ভাষণ দিবার জন্য উপস্থিত। তাঁহার দ্বারা চিত্র উন্মোচন ও স্যার রাধাকৃষ্ণণের দ্বারা ঠাকুরবাড়ির সন্ততিদের লেখা সংগ্রহটির গ্রহণের ব্যবস্থা হইল।

আধঘণ্টা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের এবং সংগ্রহ সমর্পণের সময় সমাবর্তন যজ্ঞের সহিত সূচিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে নেতৃত্ব করিবার কথা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির। ইহাতে স্যার রাধাকৃষ্ণণ ও মালব্যজী উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর সভ্যগণই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করিবেন ইহাই স্থির হইল।

কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়-এর হিসাব দেখিয়া ভাইস-চ্যান্সেলার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন রমাকে লইয়া বেনারস গমন করিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবু অসুস্থতাবশত যাইতে পারিলেন না। কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র, হিন্দুমহাসভার বাঙ্গলা প্রদেশের সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে চিত্র প্রদান করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগাম কাশীর রবীন্দ্রসঙ্গীত দক্ষ বাঙ্গালী মহিলার দ্বারা সম্পন্ন করিবার ঠিক হয়। কিন্তু কাহাকেও পাওয়া গেল না। অন্য উপায় না থাকায় স্যার রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত কলেজের মহিলা বিভাগের মাদ্রাজী প্রিন্সিপ্যালকে সাহায্য করিতে বলিলেন। মালব্যজী মেয়ে-পুরুষের সহশিক্ষা বা অবাধ মেলামেশা পছন্দ করিতেন না।

মেয়েদের হোস্টেলে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ, এমন কি রাত ৯টার পর প্রধান তোরণের ভিতর হইতে তালাচাবি পড়িত।

কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে সে নিয়ম শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

কুমারী রমা ঘোষ, সঙ্গীত কলেজের সঙ্গীতে দক্ষ (মিউজিক) সঙ্গীতে গ্রাজুয়েট বাঙলা ভাষায় অনভিজ্ঞা মহারাষ্ট্রীয় মহিলা পুষ্প কুলকারণী, কাশ্মীরী রাজকুমারী বেজওয়াজ ও হিন্দীভাষী সুশীলা ট্যাণ্ডনকে লইয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অতি আগ্রহে গানগুলি রোম্যান অক্ষরে লিখিয়া মুখস্থ করেন এবং সুর সহজে তুলিয়া লন। পরে কলেজের অন্য বিভাগের কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রী যোগ দিল। তাহার মধ্যে কলিকাতা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সতীশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন।

এই দল ৬।৭ হাজার স্নাতকদের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করিয়া শ্রোতাদের চিত্তে পুলক সঞ্চার করেন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রীতি জাগান।

আর্ট সোসাইটীর পক্ষে কলিকাতার মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহোদয় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব সু-অঙ্কিত তৈলচিত্রটি অর্পণ করেন। স্যার মীর্জা ইসমাইল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। তৎসঙ্গে লেখক (শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) শ্রীহেমলতা ঠাকুর (বড়মা) প্রদত্ত তাঁহার শ্বশুর দার্শনিকপ্রবর মহাকবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

ব্রোমাইড চিত্র অর্পণ করেন। সে চিত্রের আবরণও স্যার ইসমাইল উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠান ১৯৪৫ সালের ২রা ডিসেম্বর, কনভোকেশন সভায় অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবামাত্রই পঞ্চকন্যা শঙ্খধ্বনির সহিত ধূপ-ধুনা মাল্য শ্রীফল-এর ডালা লইয়া বরণ করে। চারিদিকে হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

তৎপরে লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় দেন এবং Tagore family Collection-এর ৭৫জন ঠাকুরবংশীয় লেখকের নামের তালিকা পাঠ করেন। তখন Pro-Chancellor হিজ হাইনেস অব গোয়ালিয়ার বলিয়া উঠেন, It is curious, আমরা ত' এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানি। এ যে রক্তবীজের ন্যায় এতগুলি ঠাকুর কোথা হতে এল, যথা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, জ্যোতিন্দ্রমোহন, প্রফুল্লকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, সৌমেন্দ্রনাথ, শুভ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ক্ষেমেন্দ্রনাথ, হেমলতা, বাণী, জ্ঞানদানন্দিনী, ইন্দিরা, প্রতিমা ঠাকুর প্রমুখ।

আমি সেই সংগ্রহটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভাইস-চ্যান্সলার স্যার রাধাকৃষ্ণণ-এর হস্তে অর্পণ করি। তিনি বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গ্রহণ করেন।

এই বাঙলা বইয়ের অভিনব সংগ্রহ বরোদা লাইব্রেরীতে রাখা হইয়াছে পৃথক আধারে। আর ইহার সহিত সকল প্রকার বাঙলা পুস্তকের সংগ্রহ সম্প্রসারণ হইতেছে। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি প্রতি বৎসর ১৫ই আগস্ট এই সংগ্রহে বাঙলা পুস্তক দান করেন।

পরদিন ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৫। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫২, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর শুভ জন্মদিন। কলিকাতা আর্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মালব্যজীর জন্মদিবস পালন করেন। অতি প্রত্যুষে পঞ্চাশটি মেয়ে লইয়া রমা ঘোষ এক বৈতালিক দল গঠন করেন।

মহিলা ছাত্রীনিবাস হইতে বাহির হইয়া বৈতালিক দলটি ভোর ৫টায়, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বাদ্যযন্ত্র সহ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিতে



স্বামী বিবেকানন্দ



ভগিনী নিবেদিতা



রেভাঃ অনাগারিক ধর্ম্ম পাল

গাহিতে হিন্দু বিশ্ববিত্থালয়ের বিশাল প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রায় তুই মাইল পরিভ্রমণ করিয়া উষার রক্তিম ছটার বিস্তারের সঙ্গে অরুণ উদয়কালে মালব্যজীর আবাসে উপস্থিত হইল।

বৈতালিক দলের গান শুনিয়া এই অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব ও মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া ছাত্রনিবাসগুলি হইতে শত শত ছাত্র-ছাত্রী এই দলের সহিত মিলিত হইল।

সেই শীতের ভোরে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী বৈতালিক দলের অনুগমন করিল, গানে যোগ দিল, তাহাদের বিশ্ববিত্থালয়ের সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই মিছিলের পুরোভাগে হাঁটিয়া করতলে গানের সুরে তাল দিতে দিতে গজেন্দ্রগমনে চলিলেন। তাঁহার পাশে দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহাশয়ও ছিলেন।

সর্বশেষে এই বিরাট বৈতালিক দল ও ছাত্র-ছাত্রীগণ যখন মালব্যজীর আবাসে পৌঁছিল তখন মালব্যজী তাঁহার বাটীর সম্মুখের বারান্দায় একটি চেয়ারে উপবিষ্ট।

মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে গাঁদাফুলের মালা হাতে লইয়া মালব্যজীর গলায় পরাইতে লাগিল।

মালব্যজীর চক্ষুদ্বয় দীপ্ত, অধরে হাস্য। আনন আনন্দোদ্ভাসিত। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রণতি জানাইল, মালব্যজী কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল যুক্তকরে নমস্কার জানাইলেন। চোখ দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

অতিথি গৃহে মালব্যজী আমাদেব চা প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং খবরাখবর লইতে লাগিলেন। এই অনুষ্ঠানের স্মৃতি ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সৌম্য-সহাস্যবদন চিত্তে চির-উদ্ভাসিত থাকিবে। জয়তু মালব্যজী।

পণ্ডিত মালব্যজীর উত্থোগে হিন্দু বিশ্ববিত্থালয়ে বাঙলা পাঠের উৎসাহের জন্য বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ চকদীঘির কুমার লীলামোহন সিংহর দানে বি-এ, বাঙলা লইয়া যে সর্বাধিক নম্বর পাইবে তাহাকে প্রিয়ম্বদা দেবী স্বর্ণপদক প্রদান করিবার জন্য স্থায়ী ভাণ্ডার হাজার টাকা দিয়া Endowment সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

১৯০২ সালে বিডন উদ্যানে আধুনিক রবীন্দ্র উদ্যানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নাটোরের মহারাজা ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং দিনসা ইত্বলজী ওয়ার্দা সভাপতি। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তাঁহার মেঘবজ্রনিনাদে ভারতের মুক্তির বাণী প্রথম শুনি এবং তাঁহার সংস্রবে আসি। তখন বয়স ১৫।১৬ ছিল। তাঁহার সেই বাণী আমাদের চিত্তে অদ্ভুত উন্মাদনা আনিয়া দেয়। তদবধি রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ও দশের সেবার অনুপ্রেরণা যোগান।

লর্ড কার্জন বাঙালীর দেশপ্রীতি এবং ভারতকে একতাসূত্রে বাঁধিবার মূল ইংরাজি শিক্ষা তাহা উপলব্ধি করেন। সেই নিমিত্ত দীন বাঙলা দেশকে ১৯০৫ সালে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। বাঙালীরা বিদেশী শাসকদের এই ভেদনীতির বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সেই বিশাল আন্দোলনের অগ্রে দণ্ডায়মান হন। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন Bengal Partition Agitation সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রবল হইয়া ওঠে। তিনি বন্দেমাতরম মন্ত্রে বাঙালীর প্রাণে নবজাগরণ আনিয়া দেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাগণ স্বদেশী মুভমেণ্ট আরম্ভ করিয়া বণিক ইংরাজদের অন্তরে বিষম আঘাত করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার অনুপ্রেরণায় আমরা স্কুল-কলেজের পড়া ছাড়িয়া স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া উঠি। বিলাতী বস্ত্র বর্জন, বিলাতী সামগ্রী পোড়ানো তখন ছাত্রসমাজের বাতিক হইয়া ওঠে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সভায় সভায় যোগদান তখন নিত্য কর্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল। মনে আছে একদিন সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়া ১০।৩০-এর সময় হইতে (তখন তিনি বারাকপুর হইতে নিত্য কলিকাতায় ঠিক সময়ে আসিতেন) রাত্রি ৮টা পর্যন্ত হেদুয়া, গোলদীঘি, ভবানীপুর,

খিদিরপুরে গিয়া ৯।১০টি জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতেন। আমিও বাইসাইকেলে চাপিয়া তাঁহার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকিতাম। স্নেহভরে তিনি সভাশেষে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করেন। আমাদের ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে টি পি মিত্র, যিনি Bengalee দৈনিক ইংরাজি পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন; সেই সময় আমাকে সুরেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া যাইতেন। কংগ্রেস নেতাদের ছবি ছাপাইবার সাহায্য করিতে আমাকে সুরেন্দ্রনাথ নির্দেশ দেন। সেগুলির প্রুফ কপি এখনও আমার সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত আছে।

সুরেন্দ্রনাথ সময়ের মূল্য খুব দিতেন; জীবনের প্রতি মুহূর্ত তিনি হিসাব করিয়া ব্যয় করিতেন। আমাদের সময়ানুবর্তিতায় ত্রুটি হইলে তিনি এমন ধমকাইতেন তেমন অন্য ত্রুটিতে দোষারোপ করিতেন না। তাঁহার সে নির্দেশ পালনের স্বভাবে মদীয় জীবনে অনেক সহজে বহু কাজ করিতে পারিতেছি এই ৮০ বৎসর বয়সেও।

সুরেন্দ্রনাথের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র বাঙ্গালা যুবকদের নিদারুণ নির্যাতন, কারাবরণ, দ্বীপান্তর গমন, ফাঁসিকাঠ হাসিতে হাসিতে বরণ করিয়াছে। বন্দেমাতরম মন্ত্রের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁহার দৃঢ়তা বরিশালের প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় দেখা গিয়াছে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হইবার ব্যবস্থা হয় বরিশালে। রাজনৈতিক কনফারেন্সে নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ রসুল, সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ একই স্টীমারে বরিশাল গিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রনাথকে দণ্ডিত করেন। তখন হাবিলদার ট্যাঙ্ক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে লুকোচুরি ও পুলিশী তাণ্ডব লীলা চলিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সাহিত্য কনফারেন্স আর হইল না।

সে যুগে সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটবিহীন সম্রাটরূপে শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তিনি দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তখন ইংরাজকে তাড়াইবার কল্পনা নেতাদের হৃদয়ে জাগে নাই। তবে তিনি সতত আমাদের জাতীয়তার আদর্শে, ন্যাশনেলিজমে অনুপ্রাণিত করিতেন।

তিনি আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহান ব্যক্তি, সুদক্ষ বাগ্মী। সে যুগে মাইক ছিল না। টাউন হলে তাঁহার বক্তৃতার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি জনগণের প্রাণে পরম উন্মাদনা জাগাইত। মনুমেণ্টের তলায় বা গোলদীঘির বাগানে তাঁহার বক্তৃতার প্রতিটি কথা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শুনা যাইত ও শ্রোতাদের হৃদয় আলোড়িত করিত। বৃটিশ রাজপুরুষরাও টলিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা "To unsettle the settled fact" করিয়া ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া লাগিল। কলিকাতা হইতে বৃটিশ রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। এই খেসারৎ বাঙ্গালীকে দিতে হইল তবুও বাঙ্গলার মাটি সত্য হইল, পুণ্য হইল। সেদিন সুরেন্দ্রনাথের আনন্দ-উজ্জ্বল যে মুখমণ্ডল দেখিয়াছিলাম তাহা আজও চিত্তে ভাসিয়া ওঠে।

তাঁহার এই দৃঢ় গম্ভীর, কর্মকুশলী প্রাণ পুত্র-স্নেহে ভরা ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভবানীশঙ্করের সহিত যখন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কন্যা মায়া দেবীর বিবাহ হয়, তখন আমরা সাহিত্যানুরাগী ব'লে কত আদর করেন, পেট ভরিয়া খাওয়ান, তখন মনে হয় নাই যে উনি সেই "সারেণ্ডার নট্" (Surrender not) সুরেন্দ্রনাথ। শেষ জীবনে তাঁহার প্রারব্ধ আদর্শ সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট পাইলেন। তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ও বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন বিল রচনা করেন এবং তাহার জন্য বিদেশী সরকারের মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

কলিকাতায় কার্জন পার্কের দক্ষিণাংশে সুরেন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই পরম অনুরাগী শিষ্য ডি সি ঘোষ মহাশয়ের সহিত এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরাও উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলাম। যতদিন বাঙ্গালী জাতী থাকিবে ততদিন সুরেন্দ্রনাথও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বাঙ্গলা মায়ের দামাল ছেলে সুভাষ আমাদের আত্মীয় বলিয়া গৌরব করিতে পারি। তবে তাঁহাকে প্রথম দেখি যেদিন তিনি বাঙ্গালী ছাত্রের অপমানের প্রতিশোধে অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে চপেটাঘাত করেন। তাঁহার গৌরবর্ণ এমনই আরক্ত হইয়াছিল যে খাস বিলাতি ওটেন সাহেবের অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই তখন কি জ্ঞানী, কি বৃদ্ধ, কি যুবক তাঁহার স্বজাতির মর্যাদা রক্ষার আগ্রহ দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন। আমিও তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকী বসু ও আমার মামা উপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ভায়রাভাই। এই সূত্রে মামাতো বোনের বিবাহবাসরে সুভাষকে প্রথম দেখি। ইংরাজ বালক বলিয়া ভ্রম হয়, তাঁহার সৌম্য তেজদীপ্ত চেহারার প্রতি তখনই আকৃষ্ট হই। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীশরৎ বসুর প্রথমা কন্যা মীরার বিবাহ আমার বন্ধু ডাঃ এস, এন, রায়ের ভাই-এর সহিত দিবার সময় আমি এই বসু-পরিবারের সহিত আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হই। আমার কন্যা রমা, শরৎবাবুর কন্যা রমা, চিত্রাদের সমপাঠী।

আমার সৌভাগ্য হয় তিনি যখন কলিকাতা করপোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসার (Executive Officer), সে ১৯২৫ সালের মে মাসের কথা। স্যার আশুতোষ মুখার্জির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমরা পাশাপাশি সুভাষের সহিত ভোজন করিতেছিলাম। তাঁহার কাছে করপোরেশন হইতে একখণ্ড জমি ভবানীপুর অঞ্চলে স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল হল করিবার জন্য দিতে অনুরোধ করি। তাহার উপর আশুতোষ স্মৃতি হল, কটেজ লাইব্রেরী স্থাপিত হইবে এবং ইহাতে দক্ষিণ কলিকাতায় জনসাধারণের মিটিং করিবার অভাবটি মোচন হইবে। স্যার আশুতোষের প্রতি এমনই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি তখনই বলিলেন, "কাল করপোরেশন অফিসে আসুন, দেখা যাক কি করা যায়।"

পরদিন অফিসে গেলে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া বেণীনন্দন স্ট্রীটে ১৪ কাঠা জমি লীজ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে জমি গলির মধ্যে বলিয়া সকলের অপছন্দ হয়, পরে তাহার পরিবর্তে হাজরা পার্কের উত্তরাংশে জমি লইয়া আশুতোষ মেমোরিয়াল হল ও কলেজের বিরাট সৌধ নির্মিত হয়।

তাঁহার নির্ভীকতার পরিচয় পাই যখন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক যিনি কলিকাতা করপোরেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পূর্বে ইংরাজ আমলে প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান সুভাষ বসুকে জানাইতে বলেন যে, তাঁহাকে অন্তরীণে রাখিতে আইন অনুসারে ধরিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমি মিঃ মল্লিকের কথা অনুযায়ী তাঁহাকে জানাই যে জনৈক নেতা সরকারের চর তিনি সুভাষকে ধরাইবার ফাঁদ পাতিয়াছেন, তাহার দুইটি প্রমাণ সুরেন্দ্র মল্লিক যেমন বলিয়াছিলেন তাহা সুভাষকে বলি।

১। সুভাষচন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহকারী একজন দেশনেতা ছিলেন। তিনি একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সুভাষচন্দ্রের নিকট তাঁহার এলগিন রোডের ভবনে লইয়া যান। তিনি সুভাষকে বলেন এ বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত একে কিছু দিতে হবে। স্বল্পভাষী সুভাষ জিজ্ঞাসা করেন, কত, উত্তরে ১৫০৲ টাকা দিতে বলেন। সুভাষ উত্তরে বলেন অত টাকা নেই। উত্তরে তিনি চেক দিতে বলেন। চেক লিখে দেন সুভাষ। তিনি বলেন Cross করে দাও। সুভাষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও Cross করাইলেন। এই ব্রাহ্মণের পুত্র একজন (Terrorist) সন্ত্রাসবাদী (বিপ্লবী)। এই চেক ভাঙ্গাইয়া Bathgate Co. হইতে বোমা প্রস্তুতকারী এ্যাসিড ক্রয় করা হয়। এই প্রমাণ তদন্তকারী হাইকোর্টের জজ সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এইরূপে প্রমাণের জোরে সুভাষচন্দ্রকে ম্যাণ্ডালে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

২। আর একদিন সেই দেশহিতৈষী এক টেররিস্টকে দুঃস্থ ছাত্র সাজাইয়া উক্ত নেতা সুভাষবাবুর নিকট লইয়া যান। তাহাকে বই কিনিবার জন্য ২০৲ টাকা পাওয়াইয়া দেন এবং সুভাষবাবুকে তাঁহার ডাইরীতে ছেলেটির নাম লিখিয়া রাখিতে বলেন, অজুহাত সে যেন আবার আসিয়া টাকা না লয়। এই ছাত্রের নাম লেখা ডাইরী সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করিবার অন্য এক কারণরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই ঘটনা সুরেন মল্লিক মহাশয়ের নির্দেশমত সুভাষকে বলাতে তিনি কেবল মৃদু হাসিলেন, কোনরূপ বিচলিত হইলেন না। যদিও তিনি আমাকে ও সুরেন মল্লিককে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন।

যখন একবার আইন সভার সভ্য হইবার নির্বাচনকালে তাঁহার ভোট সংগ্রাহকগণ তাঁহাকে ভুল সংবাদ দেন যে, জ্যোতিষ ঘোষের নিকট বহু ভোট আছে, তিনি আপনাকে না দিয়া সুরেন মল্লিকদের দলের লোককে দিবেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার নির্বাচনী স্বেচ্ছাসেবক দলের সহিত আমার গৃহে আসেন এবং দেখা হইবামাত্র বলিয়া ওঠেন—জ্যোতিষবাবু আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবেন না এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন তোমরা সময় নষ্ট কোরো না, ওকে বিরক্ত কোরো না। এইরূপই ছিল তাঁহার মানুষের উপর বিশ্বাস। তাঁহার এই শ্রদ্ধা আমার জীবনকে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সংহতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

ইহার পর তিনি যখন বৃটিশ রাজ সরকারের উৎপীড়নে জেলে বন্দী, তাঁহার (Behind Prison Bar) ছবি লইয়া তাঁহাকে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে জয়যুক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া ধন্য হই।

যখন মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সুভাষচন্দ্রের পার্শ্বে থাকিয়া এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করি। সে-কথা মদীয় মহামানব সাগরতীরে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। এক কাবুলিওয়ালা এই সৌম্য উদ্দীপ্ত মূর্তি-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ, তাহারই বর্ণনা ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ত্রিপুরী ও হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে দুই দুইবার প্রবল প্রভাবান্বিত মহাত্মাজীর চেষ্টা সত্ত্বেও মহাত্মাজীর দলের লোককে হারাইয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন, তখন মহাত্মাজী বলিলেন Subha's victory is my defeat এবং অহিংসার সাধক সুভাষের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য Working Committee গঠনে বাধা দিতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক পার্ক) অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। সুভাষ বসু সভাপতি কিন্তু Working Committee

গঠনে মহাত্মাজী, পণ্ডিত নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ভীষণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তখন বাঙলার প্রতিনিধিগণ ও লাল বাল পালের দলের লোকেরা সুভাষ বসুর Working Committee-র সভ্যের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহার পক্ষে ভোট সংগ্রহ করি। কিন্তু তাহা সার্থক হইল না। তখন সুভাষ বসু যিনি রণে কখনও ভঙ্গ দেন না, কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। :তাঁহার সেই সৌম্যশান্ত মূর্তি ভারতমাতার মুক্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিশেষত মহিলা প্রতিনিধিগণ অবিরলধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মনে আছে ঠাকুরবাড়ির বহু মহিলা যেমন গীতা ও দীপ্তি চ্যাটার্জি আমিও সুভাষের নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পদত্যাগ বাক্য উচ্চারণ হইতে না হইতেই মহাত্মাজীর দল রাজেন্দ্রপ্রসাদজীকে শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিল, প্রবল গণ্ডগোল ও টিটকারীর মধ্যে।

তাঁহার সহিত শেষ দর্শন হয় এলগিন রোড ভবনে, তিনি যখন ভিয়ানা চিকিৎসালয় হইতে (Prison in Parole) রূপ পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য বাস করিতেছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্ন ক্ষীণ দেহ, তথাপি অদম্য মনোবল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান মিলিলেই আমার জন্মভূমি মুক্ত হইবে। সকলেই জয়ধ্বনি করিবে।

সুভাষচন্দ্রের কোহিমায় রণ-উদ্যমের ফলে, আজাদহিন্দ ফৌজের গঠনে 'দিল্লী চলো' রণধ্বনি, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আজাদহিন্দ সরকার পত্তনের জন্যই যে বৃটিশ সরকার বিচলিত হইয়া উঠে, একথা তাঁহারই আজাদহিন্দ ফৌজের অন্যতম নেতা মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জি আমাকে বারংবার বলিয়াছেন। আজ ভারতের ন্যায়নিষ্ঠ যুদ্ধ দ্বারাই ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি উন্মোচন করিতেছেন দেখিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের চিত্ত পুলকে ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। 'জয়হিন্দ'।

রাজা হৃষীকেশ লাহা

কলিকাতায় সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের মল্লিক শীল ও লাহা বংশ ইংরাজদের সহযোগিতায় বিরাট বাণিজ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনে-মানে-শিক্ষায় লাহা বংশ বিশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। এই লাহা বংশ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাঙলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজ সরকারের ব্যুহর যুদ্ধের সময় প্রায় কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হৃষীকেশ লাহা চুঁচড়ায় ১৮৫২ খৃস্টাব্দে ১৪ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ সালে এনট্রেন্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জীবন কর্মময়, তিনি কেতাবী বিদ্যাশিক্ষা ছাড়িয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ধনীর দুলাল হইয়াও বিলাসিতার কবলে নিজেকে কখনও পড়িতে দেন নাই। নিজের সুখের জন্য কখনও তিনি অযথা অর্থব্যয় করেন নাই। পরহিতে অর্থব্যয় করিতে কখন দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার স্বগ্রাম চুঁচড়ায় জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিদ্যার্থীদের তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে টাকার মূল্য এখনকার প্রায় দশগুণ ছিল।

তিনি দক্ষ ব্যবসায়ী, স্বয়ং ১৮৮০ সালে কৃষ্ণদাস লাহা কোং নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ৫০ বৎসর স্বয়ং এই ব্যবসা পরিচালনা করিয়া সকলেব শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে ১৬ই মে ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৯০৬ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্সের ২৬ বৎসর সভাপতিত্ব করেন। তদানীন্তনকালে ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে এক বলশালী প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৩ বৎসর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশান নামে প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার সভার সম্পাদকরূপে উক্ত সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। ১৯২৫ সালে এই সভার সভাপতি হন। ১৯০১ সালে ভারতের আইন সভায় প্রবেশ করেন এবং ২০ বৎসর সভ্য থাকিয়া দেশের এবং দশের নানা উপকার করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রথম কমিশনার হইয়া প্রায় ২৫ বৎসর কলিকাতায় পৌরজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পৌরবাসীর বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট পৌরজনের অবাধ গতিবিধি ছিল। তিনি ২০ বৎসর পোর্ট কমিশনার ছিলেন। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ১৯১২ সাল হইতে বহু বৎসর ট্রাস্টী ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি সি-আই-ই উপাধি পান এবং ১৯১৪ সালে কলিকাতার সেরিফ হন। তিনি আচারে-ব্যবহারে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। আভিজাত্যের কোন দম্ভ তাঁহার ব্যবহারে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই।

এই মহান ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার আমার প্রথম সুযোগ হয় তাঁহার পুত্র ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত গমন করিয়া। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ এবং সহকারী সম্পাদক-রূপে আমার তাঁহার নিকট যাতায়াত খুবই ঘন ঘন হইত। এই সময় হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইবার সৌভাগ্য হয়। একটি ঘটনায় তাঁহার সরল ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা হৃষীকেশ লাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন। সে-সময় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহাশয় উক্ত ব্যাঙ্কেরও গভর্নর। স্যার রাজেন্দ্রনাথ বার্ন কোং ক্রয় করিয়া লন। তাহার জন্য স্যার রাজেন্দ্রের এক কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি বেঙ্গল স্টেট ব্যাঙ্ক হইতে ৫০ লক্ষের অধিক টাকা পাইলেন না। বিশেষ প্রয়োজন, কয়েকদিনের মধ্যে আর ৫০ লক্ষ টাকা যোগাড় করিতেই হইবে।

একদিন স্যার রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমার রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়িতে যাতায়াত আছে, তাঁহার নিকট আমায় ৫০ লক্ষ টাকা হাওলাত দিবার জন্য অনুরোধ জানাও—ইহা যেন আমার মতন ছোটলোকের মুখে বড় কথা বলার মত হইল।

কিন্তু স্যার রাজেনের মত প্রতিষ্ঠাবান, নিষ্ঠাবান লোকের কথা

এড়ানো সম্ভব হইল না। আমি সঙ্কুচিত মনে রাজা হৃষীকেশ লাহার নিকট এঁর প্রস্তাব করিলাম।

রাজা কোনরূপ ভণিতা না করিয়াই বলিলেন, "স্যার রাজেন্দ্রকে টাকা ধার দিব না ত' কাকে দিব?"

প্রতি-উত্তরে বলিলাম, "তাহা হইলে রাজেন্দ্রনাথ আপনার সঙ্গে কবে ও কখন দেখা করিবেন।"

তখন তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ, ভগ্নস্বাস্থ্য, তবুও বলিলেন, "সে কি, স্যার রাজেন আমার কাছে কি আসিবেন, আমি নরেন্দ্রকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি।"

তাহাই তিনি করিলেন এবং স্যার রাজেনকে ৫০ লক্ষ টাকা ধার দিলেন।

এইরূপ সরল, নিরহঙ্কারী পূতচরিত্র বাঙ্গালী ব্যবসাদার এযুগে যেন কল্পনাতীত। বাঙ্গলা দেশে মঙ্গলময় বিধাতা এরূপ মহান ব্যক্তির চরিত্রের আদর্শ দিয়া যুবক-যুবতী বালক-বালিকাদের অনুপ্রাণিত করেন।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

অর্ধশতাব্দীব্যাপিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিভাগে এ-যুগের বাঙ্গালীর জীবন যে-সব মনীষীর প্রভাবে গঠিত হইয়াছে, দেবপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গের খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ কায়স্থকুলের গৌরব দেবপ্রসাদ। ইনি খ্যাতনামা ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর মধ্যম পুত্র, প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। দেবপ্রসাদ হাওড়া জেলার বামনপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে দেবপ্রসাদ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। বিশ বৎসর বয়সেই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮২ খৃঃ এটর্নী পরিক্ষায় কৃতকার্য হন।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নী অফিসে শিক্ষানবীশ হন। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে এটর্নী পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। তৎ পরবৎসর হইতে এটর্নীর কার্য আরম্ভ করিয়া অচিরে এটর্নীমহলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহু বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্নী সংঘের সভাপতি ছিলেন।

দেবপ্রসাদ আত্মোন্নতির সহিত দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দেই তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি বহু বৎসর কমিশনার থাকিয়া পৌরজনহিতে তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীবিহারী সরকার প্রমুখ ২৮জন কমিশনারের সহিত পদত্যাগ করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দেন।

সর্বাধিকারী বংশধরগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনাকাল হইতেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে এই বংশ হইতে ৭জন ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃস্টাব্দে দেবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফেলো হইয়া মৃত্যুদিন পর্যন্ত ঐ

আসনে ছিলেন। তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া সিণ্ডিকেটের সভ্য, নানা সমিতির সভ্য, ভাইসচ্যান্সেলার-রূপে বিশ্ববিত্তালয় পরিচালনায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন। বিশ্ববিত্তালয়ের প্রতিনিধিরূপে তুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৬—১৯২০ সাল পর্যন্ত ভাইসচ্যান্সেলার পদে চার বৎসর অবস্থিতি করেন। কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডন সহরে ইউনিভারসিটি অব দি কংগ্রেস-এ যোগদান করিয়াছিলেন। সেই বৎসর তিনি বিলাতের বিশ্ববিত্তালয় হইতে এল, এল, ডি, উপাধিতে ভূষিত হন।

ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, এসেম্বলী ও কাউন্সিল অব স্টেটের সভ্য তিনি বহুবার নির্বাচিত হইয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে লীগ অব নেশানের অধিবেশনে যোগদান করিতে জেনেভায় ও সরকারী ডেপুটেশনের সভ্য হইয়া ভারতবাসীর ক্লেশ মোচনের জন্য সাউথ আফ্রিকায় গিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল ও বহু যশ অর্জন করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালনায় বহু বর্ষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পিতামহ যতুনাথ সর্বাধিকারীর তীর্থভ্রমণ তৎকালীন সমাজের একখানি নিখুঁত ছবি পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি ও দেবপ্রসাদের স্বগ্রাম রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আদর-আপ্যায়নে তিনি সাহিত্যানুরাগিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বহু মাসিক পত্রিকা তাঁহার নানা প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়া আছে। এই প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ও দেশের পরম উপকার হইবে। তিনি "বিলাত ভ্রমণ", "আমার কথা" ইত্যাদি কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কে, টি, সি, আই, ই, এম, এ, বি, এল, এল, এল, ডি, মহাশয় দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় আজীবন কাটাইয়াছেন। ১৮৯০ সালে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর সভ্য, ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক, মিউজিয়মের কোষাধ্যক্ষ, ন্যাশনাল

কাউন্সিলের সম্পাদক, প্রেসিডেন্সী ও রিপন কলেজের পরিচালনায় তাঁহার কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, রেফিউজ, সরস্বতী ইনঃ, সাহিত্য সভা আদি বহু প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সভাপতিরূপে তিনি তাহার অভিজ্ঞতা দান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। নিত্য নানা সাধারণ সভায় তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে কখনও ক্লান্ত দেখি নাই।

দেবপ্রসাদ নানাপ্রকার ভাষা ও বহু বিদ্যাবিশারদ, নির্ভীক, তেজস্বী, বাগ্মিপ্রবর ছিলেন। অভিজাত বংশধুরন্ধর ও বিজ্ঞ হইয়াও সৌজন্যের অবতার ছিলেন। জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি আচার ও ব্যবহারে একজন খাঁটি হিন্দু অবাঙ্গালী ছিলেন।

স্যার দেবপ্রসাদ ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণের ভাগে। হেদুয়া—বর্তমানে আজাদবাগের উত্তরে থামওয়ালা পুরাতন বাটীর দালানে একদিন তাঁহার সহিত প্রথম দর্শন হয়। প্রথম দর্শনে তিনি সস্নেহে এই বাটীর সহিত তাহার মামাতো-পিসতুতো ভাই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া আমাকে একবার রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দেখিতে আমন্ত্রণ করেন।

তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সলার ছিলেন, সেই চার বৎসর প্রায় প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যাইতাম এবং তাঁহার সঙ্গে কোন না-কোন সূত্রে দেখা হইত। সকল সময় তিনি অতি আস্থার সহিত নানা কাজের ভার দিতেন। স্যার আশুতোষের মতনই তিনি লোক চিনিতে ও গুনিজনের আদর করিতে পারদর্শী ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যখন তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন তখন সহ-সম্পাদকরূপে তাঁহার নিকট আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহারই কল্পনা অনুযায়ী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন উৎসবে ৮ই শ্রাবণ দিবসে কোন পণ্ডিতের লিখিত ভাষণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি প্রথম ভাষণ দেন। একসময় আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা নিশারাণীর সহিত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এই প্রস্তাব করেন।

এই বিবাহ যাহাতে হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা ও ইচ্ছার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল তাহাতে তাঁহারই মনের স্নেহশীলতার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি একজন বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় দক্ষ। বিশ্বভ্রমণে অভিজ্ঞ, তথাপি তিনি আচারে ব্যবহারে পোষাকে কথাবার্তায় একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মত ছিলেন। যখন রাধানগরে গিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে পুত্রের মতনই স্নেহ করিয়া তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন, নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। এইরূপ আত্মীয়তা এই যুগের গল্পকথায় দাঁড়াইয়াছে।

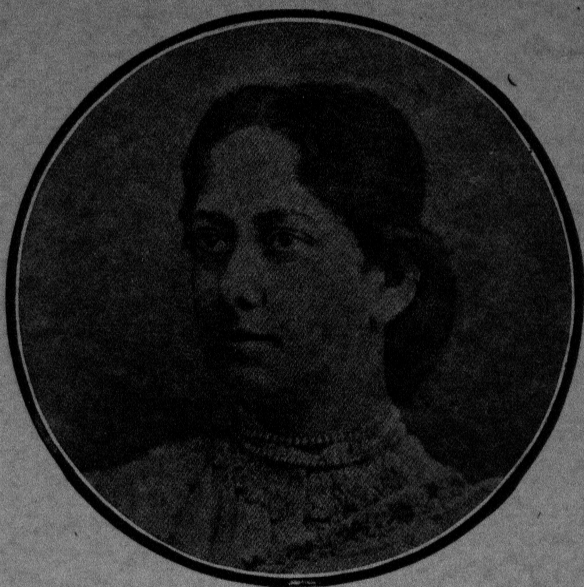
স্যার পি সি রায়

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় যে-সকল মনীষী ভারতের পুনরুত্থান যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে, টি, সি, আই, ই, ডি, এস, সি (এডিন) পি, এইচ, ডি অন্যতম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে যেমন ভারতের ঋষির প্রতীক, আবার তেমনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পণ্ডিত।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

কবির বাণী সার্থক মূর্ত হইয়াছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনায়। এক-দিকে তিনি জ্ঞানতপস্বী ঋষি আচার্য, অন্যদিকে তিনি রসায়ন-শাস্ত্রের স্রষ্টা ও পরিবেশক। তিনি যেমন জ্ঞানের প্রতীক তেমনই তিনি জ্ঞানদানের নিপুণ আচার্য। তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায়—তিন জ্ঞানতপস্বী (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, জ্ঞানচন্দ্র রায়) জ্ঞানোদ্দীপ্ত হন। এই জ্ঞানের এই ত্রিমূর্তির সংস্পর্শে আসিয়া আচার্যদেবের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার অন্যান্য ছাত্র বঙ্গের বাহিরেও যশ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। তার মধ্যে নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত অন্যতম।

১৮৬১ খৃস্টাব্দে ২রা আগস্ট খুলনা জিলার রাজুল গ্রামে, কোপতাক্ষ নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। নয় বৎসর বয়সে ১৮৭০ (খৃঃ) তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। তিনি ১৮৮২ খৃস্টাব্দে গিলক্রাইস্ট (তখনকার দিনে বিলাতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি পাইয়া) বিলাতে পড়িতে যান। সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-এস-সি ডিগ্রী লইয়া ১৮৮৮ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।



স্বর্ণকুমারী দেবী



সরোজিনী নাইডু



শ্রীমতী কামিনী রায়

পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯০২ সালে A History of Hindu Chemistry—হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি লণ্ডনে Amonium নাইট্রেট সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯১২ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক মহা-সম্মেলন লণ্ডনে হয়। সেখানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গিয়াছিলেন।

১৯৪৪ সালে ১৬ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তাঁহার প্রিয় সায়েন্স কলেজে আচার্যদেব দেহরক্ষা করেন। তাঁহার বয়স তখন ৮৩ বৎসর।

তাঁহার গৌরবময় জীবনকথা আমার বলার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তবে ৩৫ বৎসর তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া যে প্রভাব পাইয়াছি তাহা কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছি।

স্যার পি সি রায়-এর সহিত প্রথম সাক্ষাতে পরিচয় হয় রাজসাহী নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের সময় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে। সে আজ ৫৬ বৎসর পূর্বের কথা। সে সময়ের কেহ জীবিত আছে বলিয়া মনে পড়ে না; তবে সে স্মৃতি দেশ-পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিত্রতে ধরা আছে কয়েকজনের মুখচ্ছবি। তাঁর মধ্যে ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, নিখিলনাথ রায়, কুমার শরৎকুমার রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রজসুন্দর সান্যাল, শশধর রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বরিশালে ১৯০৫ সালে হইবার আয়োজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে হয়। দেবকুমার রায়চৌধুরী ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ফুলার সাহেবের মহিমায় তাহা পণ্ড হইয়া যায়। সেই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। তারপর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সেখানেও যোগদান করাতে সম্মেলনের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক আচার্যদেরের সভাপতিত্বে বঙ্গ-

সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য রাজসাহী যাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম।

বঙ্গ-সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা স্যার পি সি রায়ের বরাবর ছিল। সেইজন্যই ১৩৩৫ সালে মিরাট এবং ১৩৪২ সালে পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। পাটনায় বন্ধুবর নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত তিনদিন তিনরাত্রি আচার্যদেবের সান্নিধ্যে কাল কাটাই এবং তাঁহার কিল ও ঘুসি খাইয়া হাসিখুসির মধ্যে থাকিয়া তাঁহার সরল প্রাণের মাধুর্য উপভোগ করি এবং তদবধি নানা কাজে তাঁহার নিকট প্রায় নিত্য গমনাগমন করিতাম।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইলেও তাঁহাকে প্রথম দেখি ৯১নং আপার সার্কুলার রোড ভবনে। যেখানে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর পত্তন হয় ১৯০২ সালে। তাহারই পার্শ্বে ৯২নং আপার সার্কুলার রোডে পার্শীবাগান ভিলা বলিয়া বৃহৎ অট্টালিকা ও বাগানবাড়ি ছিল। ১৯০৩ সালে এই বাড়িতে আমার মামাতো ভগ্নী (কাশীর চৌখাম্বা নিবাসী উপেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক) ইন্দুমতীর বিবাহ হয় বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের এটর্নী জ্ঞানচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্রের সহিত। সেই বিবাহ উপলক্ষে পার্শীবাগান ভিলাতে ৭।৮ দিন ছিলাম। তখন বয়স ১৫।১৬ বৎসর। প্রতিদিন এই জ্ঞানতপস্বীকে দেখিতে যাইতাম।

যখন তিনি স্যার আশুতোষ কর্তৃক রসায়নাচার্য নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা সায়েন্স কলেজের অধিষ্ঠান করিতেছিলেন তখন প্রায় প্রতিদিন তাঁহার সকাশে যাইতাম। সেই সময়ের কয়েকটি কাহিনী বিবৃতি করিব—সেগুলি তাঁর জীবনযাত্রার সরলতা প্রমাণ করিবে।

তিনি তদানীন্তন মূল সায়েন্স কলেজের দক্ষিণ অংশের দ্বিতলের সর্বশেষ কামরায় থাকিতেন। এক সামান্য খাটিয়ার উপর শুইতেন। আশেপাশে বই-কাগজ ছড়ান থাকিত। একদা দেখি এক তিজেল (হাঁড়ী) 'ছড়া তেঁতুল' আচার পরিষ্কার করিতেছেন। আমি গিয়া তাঁহার হাত হইতে লইয়া সেগুলি সরিষার তেল দিয়া পরিষ্কার করিয়া রোদে দিলাম। তাহাতে তিনি খুবই খুশী হইয়া পিঠে গোটাকয়েক ঘুসি মারিয়া বলিলেন, "তুমি প্রকৃতই কৰ্ম্মিতকর্মা লোক, আমি ছড়া

তেঁতুল ভালবাসি তাই আমার এক ছাত্র তার মা'র হাতে তৈরি আচার দিয়ে গেছে, এখন ইহা অনেক দিন চলিবে।"

সরল হাসিতে ঘর ভরিয়া দিলেন।

তিনি যখন এই ঘরে থাকিতেন তখন লুঙ্গী পরিয়া তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া বড় সিঁড়ির সামনে "সাধারণ বাথরুমে" স্নান করিতে যাইতেন, তাহা দেখিয়া ব্যথিত হই। সে কথা তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয়কে বলি। তিনি তৎপরদিনই আমাকে সঙ্গে লইয়া আচার্যর ঘরে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের সংলগ্ন শৌচ ও স্নানাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে আচার্য পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া কত যে আশীর্বাদ করিলেন—তাহাই এখনও জীবনের পাথেয় হইয়া আছে। যখন স্নানাগার প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখানে কি একটি গ্যাস রেখে রাঁধবার জায়গা হতে পারে?"

সে ঘর ঠিকমত করে দিলে বালকের মতন হাসিয়া বলিলেন, "এখন তোমাদের তপস্বী অধ্যাপক পরম সংসারী হইয়া উঠিল।"

আবার সেই ঘুসি ও আদর।

তাঁহার ঘরের পাশের বড় সিঁড়ির চাতালে ডাঃ প্রফুল্ল বসু মহাশয় খাটিয়ায় শুইয়া থাকিতেন এবং গুরুর সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিতেন। আচার্য যখন তখন আসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতেন—পুরাকালের ঋষির আশ্রমের কথা কল্পনায় আনিয়া দিত।

একদা দেখি তাঁহার নানা স্থান হইতে প্রাপ্য অভিনন্দন, স্মারক আধার, বিশাল আকার রূপার তালা-চাবি সব গড়াগড়ি যাইতেছে। তখন তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এই দ্রব্যগুলি আমায় দিন।"

তিনি বলিলেন, "এসব তুমি কি করিবে?"

আমি বলিলাম, "সাহিত্য পরিষদে যেমন রবীন্দ্র সংগ্রহ করিয়াছি তেমনই আচার্য রায় সংগ্রহ করিব।"

হাসিয়া কুটিপাটি খান—রবীন্দ্রর পার্শ্বে এ ক্ষীণজীবীর স্থান, তুমি পাগল হয়েছ। আমি যখন বিশেষ জেদ করিলাম তখন তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, নিজের লুঙ্গী দিয়া সেই সব

মহামূল্য স্মারকদ্রব্য ও উপহারগুলি বাঁধিয়া আমায় বলিলেন, "একেবারে পালাও—তাহা না হইলে আর পাবে না।"

এমন কি সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়কে পত্র দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন যে রূপার চরকাটি উপহার দিয়াছিল, যাহাতে অভিনন্দন-বাণী উৎকীর্ণ ছিল, তাহাও দিবার জন্য লিখিয়া দিলেন। তাঁহার নাম করিয়া কে সি পাল কাঠের ব্যবসায়ীর নিকট হইতে একটি সুদৃশ্য আধার যাচ্ঞা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে রাখিয়া দিই। একবার যখন সেগুলি দেখাইলাম তখন আবার সেই সরল হাসি ও খুশি।

তিনি ভারতের বাহিরে এবং ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে প্রায়ই যাইতেন। যখনই যেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেন বলিতেন ২৬,০০০ মাইল, ৩০,০০০ মাইল। একবার বলিয়াছিলেন ৪৭,০০০ মাইল হইল এবং এবার অর্ধ লক্ষ মাইল রেলভ্রমণ করিব। ঠিক যেন বালকেরই মতন বলিতেন।

এমন সর্বজন প্রিয়, সর্বজন বিশ্বাসী, সর্বলোক মান্য ঋষি আচার্য এ যুগে দেখা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। তিনি ত' দানবীর ছিলেন। ত্রাণকর্তা ছিলেন। যখন উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্য ত্রাণ ভাণ্ডার খোলা হয় তখন এই বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণের সিঁড়ির নিকটই বস্ত্রাদি স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন যখন কলিকাতার বারবনিতা সমাজের নারীগণ দলে দলে আঁচলে করিয়া বস্ত্র, চাল, টাকা-পয়সা আনিয়া আচার্যের চরণ-রেণু স্পর্শ করিতে লাগিল, তখন স্থির, গম্ভীর, করুণামাখা আঁখি যেন সন্ধ্যাতারার মতন ফুটিয়া উঠিত, সেই চিরকুমার আচার্যর দেবাশীষ পাইয়া সেই সমাজের কলুষপরায়ণ মহিলাগণ ধন্য হইয়া গেল।

আচার্যদেব সন্ধ্যার সময় গড়ের ময়দানে লর্ড রবার্টস বা রিপনের মূর্তির পদতলে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেন এবং অনেক জ্ঞানী ও গুণীর সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। দিনের গুরুকার্য শেষে আমাকে তাঁহার অশ্বযুক্ত পাল্কী গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতেন, সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও থাকিত। সে গুরুসঙ্গ যে কত পবিত্র, কত মধুর, কত সরল তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না।

তিনি বাঙ্গলার প্রধান ঐশ্বর্য যে চরকার সুতা তাহা আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিতেন। নিজেও সময় পাইলেই চরকা কাটিতেন। অতবড় বিজ্ঞানী যে চরকার মহিমায় এতঁ আকৃষ্ট তাহা আধুনিক শিক্ষাভিমানীদের মনে ব্যঙ্গের বস্তু হইলেও আমরণ চরকা কাটার অনুপ্রেরণা দিয়া গিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা নিশারাণীর বিবাহের সময় আসিয়া 'অটোগ্রাফ' পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছিলেন— "ঘর ঘর চরকা কাটো।"

শেষ

প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ তাঁহার স্নেহ, আশীর্বাদ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আচার্যদেবের শেষ সময় তাঁহার শয্যার পার্শ্বে প্রায় আড়াই দিন থাকিয়া পরম ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবানকে ধিক্কার দিয়াছি, মরণের বিভীষিকা হৃদয়ে পূর্ণ রাখিয়াছি। শেষ-দিন যখন Oxygen Gas-এর ফ্যান্যাল নাকের অদূরে ধরিয়া থাকিতাম, নিশ্বাস লইবার কি কষ্ট তাহা দেখিয়া মনস্থির রাখিতে পারিতাম না। এই আজন্ম সংযমী, চিরকুমার, মিতাচারী, ব্রহ্মচারী, তপস্বীর মৃত্যুর সময় যদি এরূপ যন্ত্রণা পাইতে হয় তাহা হইলে মানব জীবনের প্রতি নিশ্চয় লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। তবু সেই সৃষ্টিকর্তার চরণে জীবের আত্মারই কল্যাণ প্রার্থনা করণীয়। সেই সঙ্কটত্রাণ কর্তা, দাতা, জ্ঞানী, তপস্বী তাঁহারই শেষ জীবনের সাধন ক্ষেত্র সায়েন্স কলেজে ১৯৪৪ সালে জুন মাসের এক বিকালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁর আত্মা অমর হইয়া চরাচরের কল্যাণ সাধন করুক ও পরম শান্তি পান।

যাদুর রাজা গণপতি

যাদু-বিদ্যার গল্প পৃথিবীর আদিম যুগ হতে নরনারীর মনকে মজিয়েছে। যাদু-কাহিনী সবচেয়ে পুরান কাহিনী। আমার শৈশব ও কৈশোর অবস্থায় যখন বেদেরা আমের কুসি পুঁতে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে আপেল, পেয়ারা, কলা, পেঁপের গাছ করে খাওয়াতো, থলের মধ্যে থেকে ঝনু ঝন্ করে থালা-চাটু বার করতো, ঝর ঝর করে চাঁদীর টাকা ছড়াত তখন মন আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে উঠত। তবে বর্ষীয়ানদের জ্ঞানের প্রদীপের আলোতে সব মিথ্যা, সব অলীক বলে রহস্য জানবার স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হত।

এই জগতে মানুষ যা সচরাচর করে না বা করতে পারে না তাই দেখবার জন্য মন ব্যাকুলিত হয়। সে প্রায় যাট বছর আগের কথা। গড়ের মাঠে বোসের সার্কাস দেখবার জন্য গিয়েছিলাম, তদানীন্তন সময়ে প্রফেসর বোসের সার্কাসই ভারতীয় সার্কাসের মধ্যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। সুশীলা সুন্দরীর বাঘের খেলা অতি লোমহর্ষক ও আকর্ষণীয় ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে সাহসে ও দৈহিক শক্তিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর কব্জির জোর এমনই ছিল যে গোরা সৈনিককেও পাঞ্জা লড়াইয়ে হার মানতে হয়েছিল। সুশীলা দেখাতেন বাঘের খেলা, বাঘের পিঠে চড়তেন, বাঘের মুখগহ্বরে হাত ঢুকাতেন। বাঙ্গালীর মেয়ের দুঃসাহসিক বাঘের খেলা তখন এক যাদুবিদ্যা বলেই আমাদের মনে ধারণা হয়েছিল।

১৯১৬ সালে প্রফেসর বোসের সার্কাসে প্রথম দেখলাম গণপতিকে, সার্কাসের ফাঁকে ফাঁকে মজাদার খেলা দেখিয়ে সার্কাসের দর্শকদের হাসাতেন আর তাক লাগিয়ে দিতেন। কয়েক বৎসর পরেই গণপতি জনপ্রিয় বোসের সার্কাসের এক জনপ্রিয় যাদুশিল্পী হয়ে উঠলেন, তাঁর বিখ্যাত মায়াজাল বক্স অর্থাৎ ইলিউশন বক্স দেখে আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলাম। গণপতির এই অবিশ্বাস্য অলৌকিক বক্সের খেলা দেখবার জন্য লোক পাগল হয়ে উঠলো।

ইলিউশন বক্সটি ছিল একটি বড় কাঠের বাক্স। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে দর্শকবৃন্দ বাক্সটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন। গণপতির বলিষ্ঠ দুখানা হাত পিঠমোড়া করে এবং দুখানা পাও কষে বাঁধা হল তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হল।

বাক্সটি চারিদিক থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে বাক্সের সামনে কালো পর্দা ঘিরে দেওয়া হল। এমন সময় সংকেত করা মাত্রই দুটি হাত পর্দা ভেদ করে বার হয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দা সরিয়ে দেওয়া হলপ দেখা গেল বাক্সই আছে। এবং ভিতরে থলে ছিঁড়ে গণপতিকে বার করা হল।

আর একদিন দেখলাম পূর্বোক্তরূপে গণপতিকে চিহ্নিত করে বাক্সের মধ্যে রাখা হল। বাক্সের ওপরে তবলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। দর্শকদের ফরমায়েসমত তাল বাজতে লাগল বাঁয়া-তবলাতে। পর্দা সরিয়ে দেখা গেল বাক্স পূর্বের ন্যায় তালা বন্ধই রয়েছে আবার আবরণ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর গণপতি নিজে বেরিয়ে এলেন।

এ যেন ভূতুড়ে ব্যাপার। সে সময় হতে যাদুবিদ্যা ও গণপতির প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে পড়লো। গণপতির যাদু-প্রদর্শনীর ছিল দুটি দিক, একটি দিক লৌকিক আমোদ-প্রমোদের অন্যটি অলৌকিক রহস্যের। গণপতি বোসের সার্কাস হতে বের হয়ে নিজে একটি দল করে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁবু ফেলে নানান খেলা দেখাতে লাগলেন। সে দলের খেলাও কয়েকবার দেখেছি। তিনি যাদু গাছ নামে একটি খেলা দেখাতেন। দেখলাম একটি ক্রুস খাড়া করা হয়েছে। এই ক্রুসের সঙ্গে তাঁকে শেকল, হাতকড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এই ক্রুসে আটকান অবস্থাতে তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হত, যে-কোন অবস্থাতে তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হত, যে-কোন প্রকার পোষাক ছুঁড়ে দেওয়া হত গণপতি সেই হস্তপদ বন্ধন অবস্থায় পোষাকটি ঠিকভাবে পরে ফেলতেন। এ দেখে মনে হয়েছিল গণপতি তন্ত্রসিদ্ধ সাধু এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বাস্তবিকই তিনি একজন কালীমাতার সেবক ও সাধক।

শেষ জীবনে তিনি সাধন-ভজনে কাটিয়ে গেছেন। বহু অর্থ উপার্জন করে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে কালীমন্দির স্থাপনা করেন এবং তাহা দেবোত্তর সম্পত্তি করে যান। যাতুকর গণপতিকে সাধকরূপে দেখবার আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁহার বরাহনগরের কালীমন্দিরে।

এই প্রসঙ্গে যাতুকর গণপতির অলৌকিক অদ্ভুত জীবনী কিছু বিবৃত করা প্রয়োজন মনে করি। যাতুকর গণপতির পিতা ছিলেন শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী এক জমিদার। বালক অবস্থা থেকে গণপতি গান-বাজনায় মেতে থাকতেন। পিতা লেখাপড়া না শিখিলে জমিদারী সম্পত্তির অংশ তাঁকে দেওয়া হবে না ঘোষণা করেন। গণপতি বড় জেদী ও আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর ছিল প্রচণ্ড। সতেরো-আঠারো বছর বয়সে বাড়ি হতে পালিয়ে যান। নানান রকম গুপ্ত-মন্ত্র, ঝাড়ফোঁক, অলৌকিক ঔষধ শিখবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। অবশেষে তিনি বোসের সার্কাসে যোগদান করেন। সর্বপ্রথম হাল্কা ম্যাজিক ও কৌতুকাভিনয় দেখিয়ে জনপ্রিয় হন, তারপর তাঁর ইলিউশন বক্সের খেলা দেখিয়ে বিখ্যাত হন। এবং বোসের সার্কাসের অন্য খেলা নিষ্প্রভ করে দেন, বহুদিন তিনশত টাকা মাহিনায় এখনকার হাজার টাকার তুল্য কাজ করেন।

পরে তিনি বোস সার্কাস ছেড়ে নিজে একটি যাতুখেলা দেখাবার দল গঠন করেন। তাঁর এই দলে বোসের সার্কাসে হিঙ্গলবালা—যিনি ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়া বোসের সার্কাসের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন, তাঁকে সঙ্গী লন। তাঁর কংস কারাগার একটি অপূর্ব খেলা। যখন বোসের সার্কাস ত্যাগ করেন তখন তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। প্রফেসর বোসের মাতালের দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না, এই টিটকিরিতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মদ্যপান ত্যাগ করেন। হিঙ্গলবালাকে লইয়া তাঁর বালাসিং খেলা ও নিজের যাতুবিদ্যার নানারকম খেলা দেখিয়ে প্রভূত অর্থ রোজগার করেন। সমগ্র ভারতে, বাঙলা দেশ তো বটেই শুধু যাতুকে পেশা করে এমন অসামান্য অর্থ-সাফল্য ও প্রতিপত্তি কেউ লাভ করতে পারেন নি।

যাতুকর গণপতি ছিলেন অকৃতদার। শেষ জীবনটা তিনি সাধন-ভজনেই কাটিয়ে গেছেন। দু'হাতে তিনি যেমন টাকা রোজগার

করেছেন তেমন দানও করে গেছেন অকাতরে। তাঁর মৃত্যুও এক অসাধারণ ব্যাপার। তাঁর রাধামাধব মন্দিরে অন্নকূট উৎসব হচ্ছে। নানা ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করছে, তিনি বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে—সেদিন ২০শে নভেম্বর ১৯৩৯ সাল।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

বিদেশী শাসকগণের হাত হইতে শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবাসী স্বাধীন হইল, তখন নব-ভারতের নব-রূপকারগণের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক। তিনি হিন্দুস্থানের পরম অনুরক্ত ভক্ত। দৃঢ়চিত্ত, দূরদর্শী, ভগবৎ-প্রেমী, রাষ্ট্রপ্রেমিক। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর অশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের কর্মশক্তি, সংগঠন দক্ষতা, শিক্ষা প্রসারের অভিজ্ঞতা ও মাতৃভাষার প্রীতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। শ্যামাপ্রসাদের অনুগ্রহে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হয় এবং বাঙ্গলা ভাষা প্রসারের ব্রততে তাঁহার কৃপা ও সমর্থন পাই।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া তাঁহার সহিত নূতন দিল্লী সাহেবদের সাজানো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁহার অফিস-ঘরে সাক্ষাৎ করি। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আমার সহিত সস্নেহে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সেদিন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে বাঙ্গলা প্রোগ্রাম প্রচলন এবং দিল্লীতে বাঙ্গালী শিল্পীদের দ্বারা গীত-বাদ্য শুনাইবার অবসর প্রদান করার অনুরোধ। আমার বক্তব্য শুনিয়া তিনি তখনই তাঁহার সেক্রেটারী বাজারম্যান আই-সি-এস সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আমার আবেদনের প্রতি সুবিবেচনা করিতে বলিয়া দিলেন। বলিয়াছিলেন—"Bengali litterateurs are full of patriotism and nationalism."

তাঁহারই কথায় বাজারম্যান বাঙ্গলায় দিল্লীর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর বৃহৎ কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলা ভাষার প্রোগ্রাম প্রচলনের জন্য তদানীন্তন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরকে নির্দেশ দেন। মিঃ বাজারম্যান আমাদের যুক্তি ও দাবী—সে সময় রেডিও লাইসেন্সধারীর সংখ্যা ইংরাজির পর বাঙ্গলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা সর্বাপেক্ষা উন্নতশীল ও

ওগাঁতিপরায়ণ—মানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন যে, "A.I.R. is after all a business concern and must look after the interest of people concerned."

সেজন্য প্রোগাম ডাইরেক্টর লেখককে বলেন, "Let Bengali Radio licence holders place written demand for the inclusion of Bengali Programme."

তখন দিল্লী কেন্দ্রে অপরাপর ভাষার প্রোগ্রামের প্রবর্তন হয় নাই। তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে এই নিঃ ভাঃ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, গয়া, জামসেদপুর, মীরাট, আগ্রা প্রভৃতি বাঙ্গলা রেডিও লাইসেন্স হোল্ডারগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা প্রোগামের দাবী সংগ্রহ করিয়া পাঠান হয়। এবং সদার প্যাটেলের অভিপ্রায় অনুসারেই দিল্লী কেন্দ্রে বাঙ্গলা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা হয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদেরই পত্র লইয়া ১৯৪৯ সালে সর্দার প্যাটেলের সহিত দেখা করি। সে স্বাধীন ভারতের গৌরবময় দিন, বাঙ্গালী বীর সেনাপতি জে এন চৌধুরী ও সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং সর্দারজীর পরিচালনায় হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্যকে সাঁড়াশীর আকারে আক্রমণ করে। সদার তাহার ১২, আকবর রোড ভবনে সকালে বাটির প্রাঙ্গণে সূর্যরশ্মি স্নান করিতেছিলেন (Sun Bath), প্রবেশদ্বারে গোরা সৈন্য পাহারা দিতেছে। ঢুকিতে বাধা পাইলাম; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পত্র পাঠাইয়া দিলাম—তৎক্ষণাৎ সদারজীর হুকুমে তাহারা তাহার নিকট উপস্থাপিত করিল। তিনি সাদরে বসাইলেন এবং ভারত রাষ্ট্র পরিচালনে বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার দাবী ও যুক্তি অতি মনোযোগসহকারে শুনিলেন। ভগ্নী মণিবেন প্যাটেলকে চা পান করাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

যখন আমি বলিলাম রাশিয়াতে ১৫টি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে সমমর্যাদায় ব্যবহৃত হয়, সুইজারল্যাণ্ডে ৪টি ভাষা এবং ক্যানাডায় দুইটি ভাষা (ইংরাজি ও ফরাসী) মর্যাদার পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যবহৃত হয় তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন এ সব তথ্য কোথায় পাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম যে A. B. C. in International Affairs পুস্তকে পড়িয়াছি। তৎক্ষণাৎ

বলিলেন—"আমায় ওই বই একখানি দিতে পার।" আমি তার পরদিনই বই দিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ওই সব দেশে গিয়াছ, ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে কি প্রকারে প্রয়োগ হয়, তা জান?" আমার উত্তর 'না' শুনিয়া সেই সত্যানুসন্ধানী, ভারতকে এক ঐক্যরাষ্ট্রে বন্ধনকারী মহামতি সর্দারজী বলিলেন, "ট্রাভাঙ্কোর হাউসে, রাশিয়ান এমব্যাসী খুলিয়াছে, সেখানে গিয়া এ সম্বন্ধে খোঁজ লও, আমি পাঠাইয়াছি বলিও।"

তার পরদিন ৮টার সময় ট্রাভাঙ্কোর হাউসের বিরাট প্রাঙ্গণ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। বৃটিশ গোরা সৈন্য দ্বার রক্ষা করিতেছে, অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া রাশিয়া এমব্যাসীর আফিসে ঢুকিলাম—এক রাশিয়ান মহিলা রাষ্ট্রদূতের একান্ত সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট হইতে আসিয়াছি বলাতে সাদরে আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং এম্বেসাডারকে খবর দিলেন এবং ৮ মিনিটের মধ্যে এম্বেসাডার মহাশয় আসিলেন। তিনি সর্দারজীর অভিলাষ জানিয়া তাঁহার ফার্স্ট সেক্রেটারীকে সব বুঝাইয়া বলিতে নির্দেশ দিলেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারী বেশ ইংরাজি জানেন—তিনি বলিলেন—"রাশিয়ায় পনেরটি প্রধান প্রধান ভাষাতেই সমমর্যাদায় ও স্বাধীনভাবে সোবিয়েৎ ইউনিয়ানের রাজকার্য পরিচালিত হয়। তবে রাশিয়ান ভাষাই প্রাধান্য লাভ করে বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ও বহির্বিষয়ক কাজে।" উদাহরণস্বরূপ বলেন—স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী উজবেকী-ভাষী, তিনি পোলিশ ভাষায় পোলাণ্ড হইতে এক আবেদন বা পরিকল্পনা পাইলেন—তাহা উজবেকী-ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাইল। তিনি উজবেকী ভাষায় মন্তব্য লিখিলেন তাহা তৎক্ষণাৎ পোলিশ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পোলিশ রাষ্ট্রদপ্তরে যায়। ইহার জন্য দক্ষ Translator and Typist নিযুক্ত আছে।

আর পার্লিয়ামেণ্ট বা সুপ্রীম কাউন্সিলে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বলিলেন যখন মন্ত্রী বা সভ্যগণ নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা দেন তখন সকলে Head-Phone ব্যবহার করেন। তাঁহাদের ভাষা তখনই অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া Broadcast হয় আর হেডফোনের সুইচ ঘুরাইয়া নিজ নিজ মনোমত ভাষায় তাহা শুনিতে

পারেন। ইহার জন্য দক্ষ Interpreter and Transmitter নিযুক্ত আছে।" সে জন্য ভাষা লইয়া কোন দ্বেষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

এই তথ্য আমি পরদিন সর্দারজীর নিকট বর্ণনা করি, তিনি গভীর আবেগ ও চিন্তার সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন—

"It is very expensive, however it is a good solution. You better see Panditjee."

আমার বিশ্বাস প্রজা শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি ভাষায় ব্যবহারের আংশিক স্বীকৃতি সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে সর্দারজীর হাত ছিল।

ঃ সর্দারের প্যাটেলের বাঙলা-ভাষা প্রীতি ঃ

১৩৫৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন, ১৯৪৯ খৃঃ মার্চ মাসে নয়াদিল্লীতে রাইসিনা বেঙ্গলী বয়েজ স্কুলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সূচনা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় ও লেখক নূতন দিল্লীতে ১৯৪৮ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর গিয়া স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বাধীনে করিয়া আসেন। সেই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নগেন্দ্র রক্ষিত ও লেখকের প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর স্থির হয় যে—বাংলার সঙ্গে হিন্দী, মারহাঠী, ওড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি নূতন শাখার অধিবেশন হউক। কারণ স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীকে সকল প্রদেশের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে হইবে এবং পরস্পর পরস্পরকে জানিতে হইবে। তদানুসারে ৩০শে ফাল্গুন ১৩৫৪ সালে—নিখিল ভারতীয় সাহিত্য-শাখার অধিবেশন হয়। তারপর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের নাম নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন নামকরণ হয়, লেখকেরই সভাপতিত্বে এলাহাবাদের এক সাধারণ অধিবেশনে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্বর্গীয় জি, ভি, মাভলঙ্কার (মারহাঠী সাহিত্যিক)।

এই অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অংশগ্রহণ করেন এবং সুচিন্তিত ভাষণে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন

করেন। তিনি বলেন—"যদিও দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অখণ্ডই রহিয়াছে, এসব ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশকে কেহ বিভক্ত করিয়া যাইবে না।"

একদা বাংলা দেশ হইতেই আমরা রাজনৈতিক স্বপনসুধা পান করিয়াছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ হইতে যে-সকল বিরাট পুরুষ নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা অনুপ্রেরণা পাইয়াছি। আধুনিককালে বাংলা দেশ যে দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহা কে ভুলিতে পারে। বিগতকালের দুর্ভোগের দরুণই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে। * * * এই বিভাগ সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ এই সংস্কৃতির উপর নির্ভর করিয়াই টিকিয়া আছে। ভৌগোলিক বিভাগ সত্ত্বেও উহা বিভক্ত হইবে না। মানুষ যত চেষ্টা করুক না কেন, বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিভক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। এই অনুষ্ঠানে আমি সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়াছি। আমি সাহিত্যিক নহি। একজন কৃষক সৈন্য হিসাবে আমার জীবন আরম্ভ হয় এবং গান্ধীজী যে সেনাবাহিনী গঠন করেন উহাতে আমি যোগদান করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি একজন সৈনিক হিসাবে দেশের সেবা করিতে চাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বাঙ্গলার সেবা করিব।

বাঙ্গলার যুব-সমাজকে আমি বলিতে চাহি যে, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশে কিছু করা হইলে বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গলা ভাষার ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই বাঙ্গলার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর—সে শক্তিকে আমরা যেন কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না করি। আপনারা উত্তেজিত হইবেন না, ধৈর্য হারাইবেন না, বা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইবেন না, আজ এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদিগকে একই উপায়ে সকলের সহিত প্রীতি ও সদ্ভাব রাখিয়া সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

বাঙ্গলা দেশ যতদিন না শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিতেছে ততদিন আমাদিগকে অন্য সকল কিছুই বিস্মৃত হইতে হইবে। (প্রবল হর্ষধ্বনি) কেন না, বাঙ্গলা দেশ যদি পিছনে পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলা দেশ যদি পঙ্গু ও ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে

পারিবে না—একথা মনে রাখিয়াই আমি আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন, তাহা নবভারত রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহারই দক্ষতায়, তৎপরতায় ও সার্বভৌম এক হিন্দুস্থান গঠনের পরিকল্পনায় সমস্ত করদ-মিত্র, ফিউডিটারী দুই শতের অধিক রাজ্য একে একে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

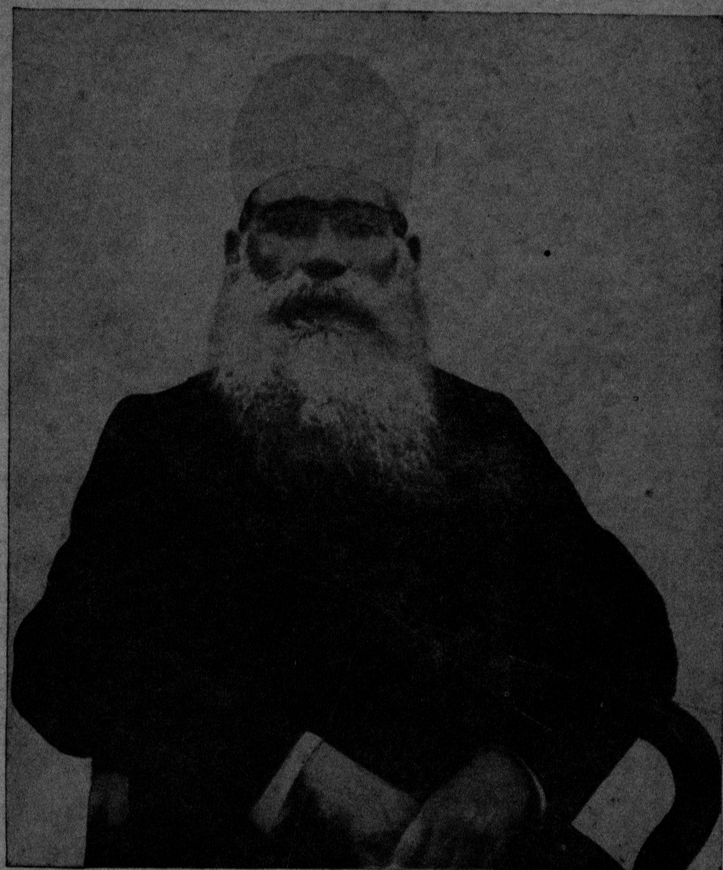
এক বৈঠকে সোমনাথ পীঠে শিবলিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্দারজীর দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া চিত্তে পুলক সঞ্চার হয়। সেই প্রেরণায় ১৯৫২ সালে ডেরাডোলে সপরিবারে গমন করিয়া সোমনাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ, ষাট হাজার জনগণের আনন্দ-উৎসব সভায় যোগদান করিয়া ধন্য হই। আরব্য সাগরের দিকে যখন তোপ গর্জন করিতে থাকে তখন হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এ উৎসবের প্রধান ব্রতী সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ৫২ জন করদ-মিত্রর হিজ হাইনেসগণ, সভাপতি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা রমা রাও, প্রধান অতিথি কংগ্রেসপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণ দেহ-ত্যাগ স্থলে প্রভাস তীর্থে স্মরণ-স্তম্ভ ভিত্তিস্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণের ২৮৩তম বংশধর জামনগরের রাজা রণজিৎ সিং. খাদ্যমন্ত্রী কে, এম, মুন্সী ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। হায়, যিনি এই পূতক্রিয়ার মূল ও উৎস সেই সর্দার প্যাটেল নাই! এ কথা স্মরণে মনোব্যথা উঠিলেও সেই মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত হইল।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত প্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ, আর স্বামীজীর কর্মের পূর্ণসাধিকা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। বিবেকানন্দের নরনারায়ণের সেবা, মানবপ্রীতি, স্বাধীনতার প্রয়াস প্রভৃতির সহিত রূপ লইয়াছিল ভগ্নী নিবেদিতার ভারতের হিতে আত্মদান। "সবধর্ম মাঝে ত্যাগ ধর্মসার" মূর্ত হইয়াছিল আইরিশ রমণী মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল-এর ভারতবাসীর সেবায়। দুইজন আইরিশ ললনা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম করিয়াছিলেন। একজন হলেন মিসেস্ অ্যানি বেসান্ট আর অন্যজন সিস্টার নিবেদিতা। গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে শক্তি ও সাহস আইরিশ রমণীদ্বয়ের স্বাভাবিক প্রকৃতি। সেইজন্যেই মিসেস্ বেসান্ট ও সিস্টার নিবেদিতা মহিলাদ্বয় ভারতের নরনারীর অধীনতা-নাগপাশের পীড়ন দূর করিবার জন্য ভারতকে তাঁহাদের সংগ্রামক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এমেরিকা বিশ্বধর্ম সভায় ভারতের হিন্দুধর্মের মর্মকথা প্রতিষ্ঠা করিয়া লণ্ডন সহরে আগমন করেন। লণ্ডনে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতেছে। লণ্ডনবাসী মুগ্ধ হইয়া হিন্দুযোগীকে দেখিতেছেন। তাঁহার কথা ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য লণ্ডনের নরনারীগণ আকুল আগ্রহে সভায় সভায় সমবেত হইতেছিলেন। এমনই এক সভায় একদিন তরুণী মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল এলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিলেন। তাঁহার রূপ ও ধর্মকথা শুনিয়া মিস্ নোবেল স্বামীজীর প্রতি পরম শ্রদ্ধান্বিত হইলেন।

উত্তর আয়ারলণ্ডের জংসান সহরে বিখ্যাত নোবেল পরিবারের মেয়ে মার্গারেট। অল্পবয়সে পিতামাতার মৃত্যু হইলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিলেন। তিনি মিশেস ক্লাবের সভ্যা হইলেন।



ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সৌজন্যে

বর্নাড-শ' এবং হাক্সলের সংশ্রবে আসিলেন। ঠিক এমনি সময় তিনি পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন। মার্গারেট অভিভূত হয়ে শুনছিলেন হিন্দু-যোগীর অমৃতকথা—বেদবেদান্ত ও উপনিষদের অমৃত বাণী। মার্গারেট মনে মনে স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু বলে মেনে নিলেন।

১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে গিয়েছেন; মার্গারেট দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর সুন্দর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি মার্গারেটের মনকে মুগ্ধ করল। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় শুনলেন, ভগবান সর্বত্র আছেন—আছেন সর্বভূতে। ভগবানকে পেতে হলে সর্ব ত্যাগ করতে হয়। এই বাণী মিস্ নোবেল মার্গারেটকে অভিভূত করে। তিনি বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিলেন। ভারতে আসিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। ১৮৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কুমারী মার্গারেট বিবেকানন্দের সহিত ভারতে এলেন। উঠিলেন গঙ্গার তীরে। তাঁহার সহিত যোগ দিলেন মিসেস্ ওলি বুল আর মিস্ জোসেবাইম ম্যাক্লাডিড্। এঁরাও স্বামীজীর শিষ্যা হইলেন। নিবেদিতার শিক্ষার ভার প্রথমে স্বামীজী লইলেন, পরে স্বরূপানন্দকে শিক্ষার ভার দিলেন। মার্গারেট ব্রহ্মচর্যব্রতের দীক্ষা নিলেন। দীক্ষার পর স্বামীজী তাঁর নাম রাখিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারত, ভারতের নরনারায়ণের সেবার পরিচয় পেলেন বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা। উৎসর্গ করলেন ভারতের নারীর সেবা ও শিক্ষার কার্যে নিজের জীবন। ২৮ বৎসরের তরুণী আইরিশ মহিলা মার্গারেট বললেন ভারতবর্ষে জন্মাতে না পারার দুঃখ ভারতবাসীর সেবা করে মেটাবো।

নিবেদিতার সেবা করিবার ব্রতর প্রথম পরিচয় আমরা পাই কলিকাতার প্লেগ্ ব্যাধিতে আক্রান্ত শত শত লোকের সেবাতে। ১৮৯৮ সালে কলিকাতায় ভীষণ প্লেগ্ মহামারীতে বহুলোক মরিতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। প্লেগের বার্তা শুনিয়া তিনি পাগলের মত ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন দলে দলে লোক কলিকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। কলিকাতাবাসীদের প্লেগের হাত হইতে বাঁচাবার জন্য, আক্রান্ত রোগীদের সেবার জন্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করিতে

লাগিলেন। নিবেদিতাকে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত সেবাকার্যে লাগাইয়া দিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ রোগীদের স্বহস্তে সেবা করিলেন, নগরীর আবর্জনা নিজে ঝাঁটা লইয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মাতৃমূর্তি দেখিয়া বঙ্গবাসীরা মুগ্ধ হইল—প্রাণে বল আনিল।

১৯০৫ সালে বিদেশী শাসকরা বঙ্গভঙ্গ করিলেন। তাহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। সেই স্বদেশী আন্দোলন দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে জানিয়া ভগিনী নিবেদিতা অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠিলেন। সেই শিখার আলোকে সমগ্র ভারত আলোকিত হইল। তাঁহার পরমগুরু স্বামী বিবেকানন্দ যে ইহাই চাহিয়াছিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা তাহা বুঝিলেন। ভারতের নবজীবন শুরু হইল, নিবেদিতাই তাহার মধ্যমণি। ১৩ নং বোস পাড়া লেন দেশপ্রেমের তীর্থস্থান হয়ে উঠল।

এই তীর্থে আমার কয়েকবার যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেখানে যাওয়া-আসা করতেন—রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন ঘোষ, স্যার জগদীশচন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, লেডী অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু, রমেশচন্দ্র দত্ত এমন কি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ অনেক ইংরাজ ও মার্কিন বন্ধুবান্ধবীরা তাঁহার এই ক্ষুদ্র ঘরে আসিতেন। এইসব মনীষীদের দর্শনে পুণ্য অর্জন করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতকে ইংরাজ শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার ইন্ধন যোগাইতেন। পরে জনগণের মুক্তিসংগ্রাম ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ইংরাজের দমন নীতির প্রচণ্ডতা চরমে উঠিয়াছিল। তখন অন্তরাল হইতে সিস্টার নিবেদিতা যে প্রেরণা দিতেন তাহা পুলিশের চোখ এড়াতে পারে নাই। একদিন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ নিবেদিতার ১৩নং বাড়িতে আগমন করেন। সে সংবাদ পুলিশ পাইয়া নিবেদিতার গৃহ ঘেরোয়া করে। নিবেদিতা পুলিশের আগমন জানিতে পারিয়া শ্রীঅরবিন্দকে "গাউন" রাখার আলমারীতে লুকাইয়া ফেলেন। পুলিশেরা তাঁহার গৃহ অন্বেষণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হইবার সংবাদ পাইয়াই সিস্টার নিবেদিতা তাঁহাকে চন্দননগরে

পাঠাইয়া দিলেন। তখন চন্দননগর ছিল ফরাসী রাষ্ট্র। শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীতে অবস্থানের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। এই সব নিবেদিতার কার্যকলাপ—গোয়েন্দা পুলিশের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। তাহারা এই বিদেশী মহিলাকেও নির্বাসন দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন। তাহা জানিয়া ভগ্নী নিবেদিতা লণ্ডনে গমন করেন এবং সেখান হইতে তিনি খবরের কাগজে ভারতবাসী বিশেষত বাঙ্গালীর উপর নির্যাতনের খবর বিলাতী কাগজে প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালাইবার জন্য অর্থসংগ্রহও করিতে লাগিলেন।

১৯০৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি মিস্ মার্গারেট ছদ্মনামে বোম্বাই বন্দরে নামিলেন এবং কলিকাতা ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে উঠিলেন।

৩১শে আগস্ট ১৯৬৬ সালে মহাজাতি সদনে, নিবেদিতা-শতবার্ষিক উদ্বোধন সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ সিস্টার নিবেদিতার প্রকৃত রূপ ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"Greatness consists in what you can renounce". The two essential tenets of religion—renunciation of ego and awakening of the spirit within found their true expression in Nivedita's life. She gave up the world and engrossed herself so much in the welfare of the Indian people that every British ruler suspected her to be an anarchical Nationalist.

নিবেদিতার চিত্তে মানব-সেবার বীজ উপ্ত ছিল। সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ইংলণ্ডে দেখা হইবামাত্রই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বামীজীও রত্ন সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, যেমন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনেই নরেন্দ্র দত্তকে চিনিয়াছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতার উপর স্বামীজী প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই অলৌকিক প্রভাবে মিস মার্গারেট স্বজন, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের দেশবাসীর কল্যাণে ভারতবর্ষে ছুটিয়া আসিলেন। বাঙ্গলার নারীর মতনই তাঁহার আচার, ব্যবহার, বেশভূষা, ভারতের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়া পরম

তৃপ্তিতে বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকেন এবং দেশেরই একজন নারী হইয়া উঠিলেন, সেবায় ও ভালবাসায় ভারত-নরনারীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিবেদিতার চিত্ত ছিল পাকা সোনা, খাদ নাই। তাই তিনি বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় বরণীয়। ভারত-বন্ধু বিদেশী যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বিদেশী শাসন মুক্ত না হইলে কোন জাতির সহজ বিকাশ ও প্রকাশ হয় না, জগত সভায় আসন মেলেনা। অ্যানি বেসান্টও সেইজন্যই হোমরুল আন্দোলন চালাইয়া ধন্য হন। নিবেদিতা জীবনের শেষ বৎসর যখন দার্জিলিং-এ বাস করিতেছিলেন তখন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি বাংলা ভাষা, তাঁহার গুরুর ভাষা বলিয়া শ্রদ্ধা দেখান। বাংলা ভাষার মধুরতা, সরলতা, নানা ঐশ্বর্যর গুণগান করেন এবং অবঙ্গভাষীদের মধ্যে বঙ্গভাষা প্রসারে উৎসাহ দেন।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির নেপালী ও পাহাড়ীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার দার্জিলিং জেলার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে যাই এবং বাৎসরিক সভায় যোগদান করি। সে সময় নিবেদিতার এক মৃত্যু-বার্ষিকী স্মরণসভা হয়, সেই সভায় আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করি এবং তাঁহার উপরের উদ্ধৃত উক্তি বলি এবং তাঁহার সহিত দু'একবার সাক্ষাতের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করি। সিস্টার নিবেদিতার তদানীন্তন বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধের উৎস নির্দেশ করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ করেন।

ভগিনী নিবেদিতার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল মানবের সুকুমার বৃত্তি বিকাশ এবং স্বাধীন চিন্তার পরিবেশ না হইলে কোন জাতির বড় হওয়া সম্ভব হয় না। বিদেশী বা প্রতিকূল রাষ্ট্র ও সমাজ শাসনের মধ্যে কোন জাতির স্বাভাবিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেই নিমিত্ত ভারতবাসী বিদেশী শাসন শৃঙ্খল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছিলেন। গীতার ভগবদ্বাক্য "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" মন্ত্র তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল। গুরুর ন্যায় তিনি কর্মযোগিনী ছিলেন। তাই তিনি বাংলার নির্বাচিত রাজনৈতিক দেশহিতৈষী পুরুষ ও স্ত্রীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন।

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না এই গুরুবাক্যে তাঁহার গভীর আস্থা ছিল, সে জন্যই তাঁহার নর-নারায়ণ সেবাব্রত সার্থক হইয়াছিল। আজ তাঁহার শতবার্ষিক উৎসবে তাঁহার অবদান স্মরণ ও মননই পুণ্য। স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছিল তাঁহার শিষ্যা আইরিশ রমণী মার্গারেট ই নোবেলের উপর যাদুমন্ত্রেরই মতন। সেইজন্যই রাষ্ট্রপতির মতে—

"There are some people in the society who thought they would become big if only they can amass wealth or wild political power, but these people were mistaken ; even if they attain high position they will never be respected by the people and hence they always suffered from inward dissatisfaction. But Sister Nivedita dedicated herself for the upliftment of the fair sex as well as for the down-trodden under the inspiration and guidance of Swami Vivekananda, the great apostle of Hinduism which indicated her deep love for this great City of East wherein she once lived and moved".

হে দেবি! তোমার চরণে শতকোটী নমস্কার। তোমার আদর্শে আমার দেশবাসী অনুপ্রাণিত হউক, এই প্রার্থনাই অশীতি বৎসর বয়োবৃদ্ধ বৃদ্ধের পরম আকুতি। এ বঙ্গভূমি ধন্য তোমার চরণস্পর্শে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ ভগিনী নিবেদিতার ব্রত ও আদর্শ অনুশীলন করিতে ভারতবাসীকে বলিয়াছেন—

"She learned from her Guru it was only through renunciation and dedicated service that she could realise the universal spiritual goal. Without real love for fellow beings no one could understand the significance of the oneness of humanity at large. No one need be afraid of those sceptics of true religion in life."

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০৪ সালে বরদার গায়েকোড়ে স্যার সয়াজী রাও

(সামন্ত রাজাদের মধ্যে অর্থে, শিক্ষায়,মানে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী) এর রাজ্যে রাজস্ব সচিব ছিলেন। সে সময় তিনি নিবেদিতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"প্রশাসন সংক্রান্ত যাহা হইবার প্রকাশ্যেই হউক। কোন কিছু গোপনে, চুপিসাড়ে যেন না হয়। সর্বসাধারণের প্রশ্ন যেখানে জড়িত—সেখানে অত্যাচার—খেয়ালখুশি দ্বারা কখনও কোন সফলদায়ী কার্য হইতে পারে না।"

হে দেবি ! তুমি ভুলেছিলে নীচ, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর মধ্যে সকল প্রভেদ। প্রাণ বিসর্জন করেছ জগতের কল্যাণে, আচণ্ডাল দিয়েছ প্রেম, গুরুরই মতন ভালবাসিয়াছিলে ভারতের নরনারীকে, দেখেছিলে তাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরের সত্তা—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন ভারতে নারীগণের শিক্ষায় পাশ্চাত্য দেশসম উন্নতি না হইলে স্বদেশের মুক্তি সম্ভব নহে। তিনি বলতেন, "এক পক্ষে পাখীর উত্থান সম্ভব নহে।" তবে শিক্ষা হবে ভারতীয় আদর্শে। তিনি কম্বুকণ্ঠে বলেছেন—হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। স্ত্রী-শিক্ষার পরিকল্পনা এ যুগে রূপায়িত করতে গেলে স্ত্রী-মঠও স্থাপন করা প্রয়োজন। যেমন পুরুষদের জন্য তিনি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৯৭, ১লা মে স্থাপন করেছেন, তেমনই স্ত্রী-মঠও স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রী-মঠের কেন্দ্রে থাকবে জননী সারদা দেবীর আদর্শ জীবন—সকল সাংসারিকতার ঊর্ধ্বে থেকেও যে পূতজীবন পালন ও ভগবৎ সাধনা চলতে পারে তাহাই সারদা মাতার আদর্শ।

এ কাজ নারীদের দ্বারা সম্পাদন হওয়াই উচিত ছিল। তাহার জন্য তিনি পেয়েছিলেন মহীয়সী মহিলা ভগিনী নিবেদিতাকে; ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর, কালীপূজার দিন তাঁহার পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন ভগিনী নিবেদিতা। ইহারই শাখা-প্রশাখা সারদা আশ্রম, নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ, রামকৃষ্ণ মহিলা সংঘ বাংলার নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সিস্টার নিবেদিতা, স্বামীজী যখন ১৮৯৯ সালের ২০শে জুন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন তাঁর সঙ্গে যান। দুই বৎসর ভ্রমণের ফল হয় অপূর্ব: আমেরিকায় ভারতের দর্শন, বেদান্ত শিক্ষা দিয়া বেড়ান। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে যে সময় স্বামীজী ইউরোপে আসেন, সেই সময় লণ্ডনে ক্লাশ ও বক্তৃতা শুরু হলো। এইখানেই মিস্ মার্গারেট নোবেল তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই মিস্ নোবেলকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন। নাম দেন ভগিনী নিবেদিতা। তদবধি সুদীর্ঘ ১৮৯৭ সাল হইতে এই মহীয়সী মহিলা ভারতের নরনারীর সেবায় আত্ম-উৎসর্গ করেন। তাঁর তিরোধান ১৯১১ সাল, রায়ভিলা দার্জিলিং। স্বামীজী স্ত্রী-শিক্ষার পরিকল্পনা মূর্ত করেন। মৃত্যুসময়ে উপস্থিত ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসু।

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীজী দ্বিতীয়বার পশ্চিম যাত্রা করেন ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন। এবার সঙ্গে ছিলেন স্বামী তূরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০০ সালের ২৪শে জুলাই যখন স্বামীজী আমেরিকায় ভ্রমণ শেষে ইউরোপে আসিলেন তখনও সিস্টার নিবেদিতার সহিত তাঁর মিলন হয়। স্বামীজী যখন প্যারিসে আসিলেন তখন নিবেদিতাও তাঁর সঙ্গে ফরাসী ভাষা শিখেন, নিবেদিতারই অনুপ্রেরণায় ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম কালভে ও মিস্ ম্যাকলাউড নিবেদিতার পথ অনুসরণ করে স্বামীজীর শিষ্যা হন।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে বেলুড়মঠে স্বামীজী প্রথম দুর্গা প্রতিমা পূজা আরম্ভ করেন। বিদেশিনী বাঙ্গালীর মাতৃরূপে কন্যারূপে দেবীকে আত্মীয়রূপ সাধন-ভজনে পরম আকৃষ্ট হন— ভক্তগণের সঙ্গে বলেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু, মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥

বিবেকানন্দ বুঝিলেন ভারত-ললনাদের শিক্ষা না দিলে জাতি গঠনের ও মুক্তি সাধনা পূর্ণ হইতে পারে না। সেই জন্য এই

গুরুভার তাঁহার মানস-কন্যা নিবেদিতার উপর অর্পণ করেন। ১৮৯৮ সালের ১৫ই নভেম্বর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কলিকাতায় নিবেদিতা বিদ্যালয় খোলা হয়। সিস্টার নিবেদিতা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ইহার প্রধান অর্থ যোগাইয়াছিলেন মিসেস্ ওর্লিবুল ও মিস জোসেফাইন ম্যাকলউড্। এই ওর্লি-বুলকে বিবেকানন্দ ধীরা মাতা বলে ডাকতেন। ১৯১০ সালে ওর্লিবুলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিবেদিতা আমেরিকায় ছুটিয়া যান। তাহার পরে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল, তথাপি কাশী, হরিদ্বার হইয়া কেদার-বদ্রীপথে গমন করিলেন। সঙ্গে ছিলেন জগদীশ বসু ও অবলা বসু। তীর্থভ্রমণের পর নিবেদিতা জ্বরে পড়িলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহারি আর এ-জগতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি চালাইবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শান্তি পাইবার জন্য দার্জিলিং গেলেন। শেষ মুহূর্তের জন্য শান্ত-ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রোগবৃদ্ধি পাইল। খবর পাইয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে দার্জিলিং লইয়া গেলেন। ১৯১১ সালে রায়ভিলায় জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল।

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলার কৃতী সন্তান। যে-সব মনীষী বাঙ্গলার বাহিরে উত্তর, পশ্চিম, মধ্যভারতে ইংরাজি শিক্ষার ও সভ্যতার বর্তিকা বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হায়দারাবাদের নিজাম ও তাঁহার রাষ্ট্র বৃটিশ শাসিত সাম্রাজ্যের সর্ব প্রধান করদ মিত্র রাষ্ট্র ফিউডিটারী স্টেট ছিল। বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও ধর্মসংঘের প্রধান ছিলেন তুরস্কের সুলতান। সুলতানের দুই কন্যা প্রিন্সেসদের সহিত নিজামের যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতার সহিত বিবাহ হয়। ইহাতে নিজাম ইসলাম জগতে প্রতিষ্ঠাবান নেতা হন। ভারতের মুসলমান জগতে প্রিন্স আগাখাঁ যেমন ধর্মগুরু ও ধনী, তেমনই হায়দারাবাদের নিজামও প্রতিপত্তিশালী নেতা এবং ভারতে সর্ব প্রধানবিত্তশালী।

হায়দারাবাদে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার পায় ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভায় ও দক্ষতায়। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন ছিলেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি উর্দুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যদিও তাঁহার ছেলেমেয়ে সকলেই ইংরাজি ভাষায় সুদক্ষ। সরোজিনী নাইডু ও হারীন চট্টোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় প্রতিভাবান, ইংরাজি দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ও কথাবার্তার মাধ্যম ছিল।

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পত্নী ঘরে-বাহিরে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কহিতেন এবং বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার পালন করিতেন। সরোজিনীর মাতা বরদাসুন্দরী বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই সহজাত কবি-প্রতিভা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রভাব সরোজিনী ও হারীনের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। বরদাসুন্দরীর গীতিকাব্যগুলি তদানীন্তন কবিসমাজে

আদরণীয় ছিল। বরদাসুন্দরী সুগায়িকা ছিলেন এবং রন্ধন-পটীয়সীও বটে।

অঘোরনাথ কলিকাতায় বহুদিন ২, লাভলক স্ট্রীটে থাকিতেন, এই গৃহ মদীয় ৩৫।১০—৩৫।৬।১—পদ্মপুকুর রোডের অতি সন্নিকটে ছিল। অঘোরনাথ প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বড়লাটের বডিগার্ড লাইনের বৃহৎ মিলিটারী ছাউনি বেড় দেওয়া নির্জন রাস্তায়। এই রাস্তার পাশে সেই যুগের খ্যাতি ঠাকুর ও চৌধুরী বংশের সত্যেন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্র ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, স্যার এ, চৌধুরী, কে, এন, এম, এন, জে, এ এন, এস, এ চৌধুরী সাত ভ্রাতাগণ বাস করিতেন। এই অঞ্চলকে বাবু বৃন্দাবন বলা হইত। ওই রাস্তায় ভ্রাতাগণ চক্র দিয়া অঘোরনাথ মদীয় পদ্মপুকুর ও বেলতলার মোড়ের বাটির রক এ বসিতেন ও বিশ্রাম করিতেন।

অট্টহাস্য করিয়া অঘোরনাথ একদিন বলিলেন, "জান, আমি প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করি বরদাকে। সে এক রূপকথার কাহিনী।" অতি আগ্রহে বলিলাম, "একটু বলুন।" অঘোরনাথ বলিতে লাগিলেন—"ছেলেবেলা হইতেই আমি নৌ-বিহার ভালবাসিতাম, জান ত' পূর্ববঙ্গই নদী-মাতৃকার দেশ, কোন গ্রামে এ বাড়ি হতে অন্য বাড়ি যাইতে হইলে সালতি, মাটির গামলা বয়ে যাইতে হয়। এইরূপ ভ্রমণের সময় একদল ডাকাতের হাতে পড়ি। তাহারা আমায় ভালবাসিল, পরে ভক্তি করিয়া তাহাদের সর্দার করিয়া বসিল। ডাকাতের দলের না—বিশুদ্ধ প্রেমের। আমার বয়স যখন ১৪, নৌকা হইতে নদীতীরে এক ৯ বৎসরের বালিকাকে দেখিলাম, জলদেবীর মত জল লইয়া যাইতেছে—কলসী কাঁখে মল বাজাইয়া চলিয়াছে। ব্যাস প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়িলাম, দস্যু মাঝিদের সাহায্যে, মেয়েটিকে বিবাহ করিবার সুযোগ পাইলাম। জীবন আমার ধন্য হইল, সুখ-দুঃখে প্রকৃত সহধর্মিণী তোমাদের দিদিমণি বরদাসুন্দরী।" খানিক হাসিয়া বলিলেন—"জান, তোমাদের দিদিমণি কেবল গান গাহিতে জানে না, নাচিতে জানে, যাহার মন সরল তাহার আবার লজ্জা-সরম কি?" বলিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইলেন অঘোরনাথ। এই সুখী দম্পতির প্রভাব অঘোরনাথ ও বরদাসুন্দরীর ৮টি ছেলেমেয়ের উপর পড়ে। তাঁহাদের প্রথমা কন্যা সরোজিনীর জন্ম হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯। আর কনিষ্ঠা কন্যা

জন্মান ২রা এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ, তিনি নানা ভাষা জানিতেন, তিনি পাঠ্য অবস্থা হইতে ইউরোপে বাস করেন এবং ১৯৪২ সালে জার্মানীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অঘোরনাথের আর দুই সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ ও রণেন্দ্রনাথ হায়দারাবাদেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্য কন্যাদের মধ্যে মৃণালিনী মাদ্রাজে থাকিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের লালন-পালন করেন। আর দুই কন্যার নাম সুনলিনী ও সুহাসিনী।

পিতামাতার প্রভাব ৪ ছেলে ও ৪ মেয়েদের উপরে কত গভীর ছিল তাহা শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিতে বুঝা যায়। তিনি তাঁহার "Life and myself" পুস্তকে লিখেছেন, (৭১ পৃষ্ঠায়)

"They are not merely human parents, but rare spiritual beings, high points of evolution, two truly unworldly light walking through the darkness of life illuminating it whereever they walked, casting hope and blessing on whatever they met in life's readway, What a great and wonderful parents ; linked in the history of man in general and their spiritual integrity. Parent's house is a museum crowded with medley of strange types—some even verging on the mystic, for our home was opened to all alike."

সরোজিনী নাইডু একদা সুরাট কংগ্রেসে বলেন—

"I suppose, in the whole of India there are few men, whose learning is greater than his, and I don't think there are many men more beloved."

অঘোরনাথের প্রভাব ও শিক্ষায় সরোজিনী নাইডুর শিক্ষা-দীক্ষা, ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতা, কবিত্ব ও সংস্কৃতির দক্ষতা ফুটিয়াছিল। তাহা অঘোরনাথ একদিন নিজে বলিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে প্রাতভ্রমণ শেষ করিয়া আমাদের রক-এ বিশ্রাম করিতে করিতে তাহা হাসিয়া বর্ণনা করেন, জান, তোমাদের মহিলাকবিটি ছেলেবেলায় কত ইংরাজি ভাষার বিরোধী ছিল। আমার ধারণা ইংরাজি পৃথিবীর মধ্যে অতি সমৃদ্ধশালী ভাষা, ইংরাজি না জানিলে

আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান পাইব না, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যায় আমাদের জ্ঞান সীমিত হইয়া যাইবে, দেশাত্মবোধও তেমন ফুটিয়া উঠিবে না, ইংরাজি ভাষাই ভারতের নানা ভাষীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করিবে।

সরোজিনী আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তাহাকে ইংরাজি শিখিতে বলি, কিন্তু সে আমার অবাধ্য হইল। ইংরাজি শিখিতে নারাজ। জান একদিন আমি কি শাস্তি দিলাম তাহাকে। তখন তাহার বয়স ৯ বৎসর, একলা তাহাকে আমার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলাম সমস্ত দিন। আমারই ত' মেয়ে, সে কাঁদিল না, ভয় পাইল না, তাহার বন্দিশালায় গোক্ষুরের মত কিছু দেখিল না। সরোজিনী আবার সাদরে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজি ভাষায় এমনই দখল করিল যে বিজ্ঞ, বাগ্মী ও মধুর কবি হইয়া উঠিল। সরোজিনী বুঝিয়াছিল, "জননী তাড়না করে সন্তানেরই মঙ্গল তরে।"

কন্যা সরোজিনীকে উচ্চশিক্ষা দিবার সকল রকম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময় নিজাম সরকারের বিলাতে পাশকরা রাজবৈদ্য ডাঃ ভরদ্বাজ লু নাইডু সরোজিনীকে দেখিয়া ও তাঁহার প্রতিভার প্রখরতায় মুগ্ধ হন এবং বিবাহ করিবার প্রস্তাব অঘোর-নাথের নিকট করেন। ইহাতে অঘোরনাথ বিরক্ত ও বিস্মিত হন। তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেশব সেনের নববিধান মতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণ রক্তের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি অব্রাহ্মণ-এর সহিত সরোজিনীর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার স্ত্রীরও ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু উদারপ্রাণ অঘোরনাথ সরোজিনীর মন বুঝিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন। যখন বরদাসুন্দরীর নিকট জানিলেন সরোজিনী নাইডুকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তখন অঘোরনাথ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। তিনি সরোজিনীকে দূরে বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহার মন পালটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিজাম বাহাদুর অঘোরনাথের কন্যাকে বিলাতে আড়াই বৎসর অধ্যয়ন করিবার জন্য খরচ মঞ্জুর করিলেন। অঘোরনাথ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিন্তু সরোজিনী বিলাতে বেশিদিন রহিলেন না, ভারতে ফিরিলেন এবং নাইডুকেই বিবাহ করিলেন।

বরদাসুন্দরী একজন দক্ষ পাচিকা ছিলেন। তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তৃপ্তি পাইত। তাঁহার রান্নাঘরের আশেপাশে হায়দারাবাদের নিজাম সরকারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণ মজুর পর্যন্ত উদয়-অস্ত জমায়েত হইত। কলিকাতার লভলাক স্ট্রীটের তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রজনী রায়—যাঁহার নামে রায় স্ট্রীট, শশিভূষণ দত্ত, ক্ষীরোদ চৌধুরী, বহুবাজারের শ্রীনাথ দত্ত প্রমুখ।

অঘোরনাথ কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন। নববিধান সমাজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, তাই তিনি অতি কঠোরভাবে কুলীন নারীদের উদ্ধারের জন্য দল বাঁধিলেন। জুটি হইল অঘোরনাথের জ্ঞাতি ভ্রাতাদ্বয় নবকান্ত ও নিশিকান্ত, শীতলকান্ত ও বাসন্তী দেবী। দেশবন্ধুর পত্নীর পিতা বরদাকান্ত হালদার। তাঁহারা মৃত্যুমুখযাত্রী বৃদ্ধাদের হাত হইতে যুবতী ও নাবালিকাদের উদ্ধার করিতে লাগিলেন —যাহাদের পিতামাতা কুলীন ধর্ম রক্ষার জন্য বিবাহ দিতেন। এই সব মহিলাদের উদ্ধার করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ইহাই ভারতের আধুনিক শিক্ষার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার প্রথম স্কুল। দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ও বঙ্গমহিলাদের ইংরাজী শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইল।

অতি শীঘ্রই অঘোরনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মেয়েধরা আইনে বিব্রত হইলেন। অঘোরনাথ তখন বিলাতে অধ্যয়নের সুযোগ পাইলেন। যে জন্য তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ভারত আশ্রমে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীদের রাখা হইত। বরদাসুন্দরী এই আশ্রমের একজন সেবিকা ছিলেন।

অঘোরনাথ রসায়ন বিদ্যালাভের ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ইয়োরোপে কেমিস্ট্রী পড়িবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গীল ক্রাইস্ট ও বাক্সটার ফিজিকাল সায়েন্স ও হোপ বৃত্তি লইয়া গমন করেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে ডি এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই প্রথম এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস সি পান। তারপর তিনি জার্মানীতে কেমিস্ট্রী পড়িতে যান। বিখ্যাত ডাচ্ কেমিস্ট Van't Hoff মহাশয়ের বার্লিনের

নিকটস্থ রসায়নাগারে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন, Every letter of Aghornath was pronounced with wonderful accuracy. কিন্তু অঘোরনাথ কেমিস্ট্রীর চর্চা ছাড়িয়া দিলেন। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"A giant intelect was practically lost to India, at least as far as Chemistry was concerned".

যখন অঘোরনাথ রাজনৈতিক আবর্তে পড়িয়া হায়দারাবাদ হইতে বিতাড়িত হন তখনও আচার্য পি সি রায় বলেন,—

"Aghornath on his return to India becomes head of the Education Department in the Nizam's dominions but unfortunately embroiled himself in party-politics and was in the fore-front of the National movement. I remember as a boy reading the Hindu Patriot one day in which Editor (Kristo-das Pal) lectured to the school master (meaning Aghornath) to keep clear of politics."

—(Autobiography of a Bengali Chemistry-P—107)

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পরই ১৮৭৮ খৃঃ নাগাদ ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হায়দারাবাদ রাজ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আহ্বান করা হয়। ইংরাজির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল অঘোরনাথ প্রথমে পত্তন করেন। তাঁহার উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার দক্ষতা এবং তাঁর প্রগাঢ় গঠনমূলক শক্তির জন্য নিজাম বাহাদুরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন। অঘোরনাথ কয়েক বৎসরের মধ্যে হায়দারাবাদ কলেজ স্থাপন করেন এবং অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। ইহাই পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিখ্যাত নিজাম কলেজে পরিণত হয়। আজও তাহার দেওয়ালে ডাঃ অঘোরনাথের চিত্র শোভা পাইতেছে।

ডাঃ অঘোরনাথ তাঁহার পত্নীর সাহায্যে একটি নারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ভারতে বিজয় রথের চক্র কেবল পুরুষ ঠেলিবে না, ইহার জন্য চাই নারীর সহযোগিতা। এই

নারী কলেজই শেষে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রধান কলেজ রূপে এখন দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে শিক্ষিত মহিলাগণই নারীর সর্ব মঙ্গল, কি অর্থনৈতিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সমাজ সংস্কার কার্যে অগ্রণী।

তিনি বাল্য-বিবাহ রহিত ও বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা হায়দারাবাদে চালু করেন। তিনি অধ্যক্ষা হইয়াও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সুখ ও দুঃখের সমভাগী হইতে লাগিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার জনসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার বাটীতে নিত্য দরবার বসিতে লাগিল। ইহা পরে "আনগ্রিমা-এ-ইকওয়ান ইউস সাফ" অর্থাৎ ভ্রাতৃসংঘ নামে খ্যাত হইল।

তাঁহার পাঁচ বৎসরের সাধনা হায়দারাবাদ রাজ্যে এমন এক সাড়া আনিয়া দিল যে ইহার প্রতিটি নরনারীর হৃদয়ে অপূর্ব স্বরাষ্ট্র চেতনা জাগাইয়া দিল। এই স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও রাষ্ট্র-চেতনা এমনই প্রবল আকার ধারণ করিল যে এত বড় শিক্ষা অভিযান হঠাৎ বাধা পাইল। ১৮৮৩ সালের ২০শে মে ডাঃ অঘোরনাথের চাকরী অস্থায়ী বরখাস্ত (Temporary Suspend) করিয়া নিজাম রাজ্যে বৃটিশ পররাষ্ট্র অধিনায়ক (পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট) তাঁহাকে হায়দারাবাদ হইতে পাঠান-সৈন্য দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তাঁহাকে নিজ অর্থে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিতে দিল না। তিনি তখন উপস্থিত তাঁহার অনুরাগী নরনারীদের বলিলেন—"আমি এই নিম্নশ্রেণীর কামরায় স্বেচ্ছায় ঢুকিতেছি না। আমায় জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকাইয়া দিতেছে।"

কয়েক বৎসর পরই আবার ডাঃ অঘোরনাথের ডাক পড়িল। নিজামের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় হইতে তিনি আবার নিজাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাধারণ ও নিজাম রাজবংশের পুরুষ ও নারীর হৃদয়ে উচ্চশিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি উর্দু বিষয় পঠন-পাঠনের এমন সুন্দর ও উচ্চ মানের প্রবর্তন করেন যে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে উচ্চশিক্ষার্থীরা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিয়া আসিল।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। তখন অঘোরনাথের চেষ্টায় হায়দারাবাদবাসীরাও কংগ্রেসের শাখা স্থাপনের

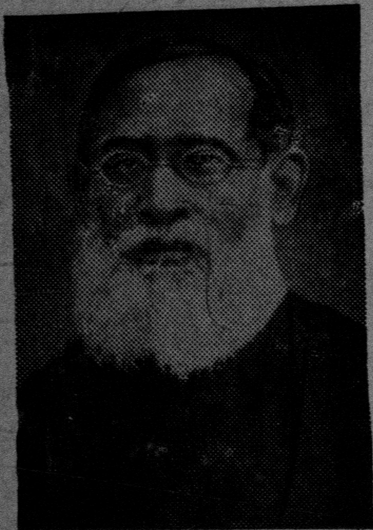
অনুমোদন পাইতে লাগিল। লাল-বাল-পালের বামপন্থী পন্থিগণও হায়দারাবাদ রাজ্যে অঘোরনাথের সাহায্যে অভিযান চালাইতে লাগিল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষে দিকে দিকে আহ্বান চলিল, বন্দেমাতরম জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হইতেছিল। বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদ হায়দারাবাদে ঢুকিল। অঘোরনাথ এইসব আন্দোলনের পিছনে ছিলেন।

হায়দারাবাদ রাষ্ট্র এই সব আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলিতেছিল, এমন সময় ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১শে তারিখে নাসিকের কালেকটার মিঃ জ্যাকসনকে মহারাষ্ট্র যুবক অনন্ত লক্ষ্মণ কনাড়ে গুলি করিয়া হত্যা করে। যে বন্দুকের দ্বারা জ্যাকসন সাহেব নিহত হইয়াছিলেন তাহা হাযদারাবাদ নিজাম সরকারের বলিয়া প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহু নগরবাসীকে সন্দেহ করা হয়, অনুসন্ধান ও নির্যাতন চলে। তাহার ফলে শিক্ষা বিভাগ হইতে অনেক শিক্ষক ও কর্মচারী বিতাড়িত হন।

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হায়দারাবাদ হইতে বহিস্কৃত হন। তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সময়ের পূর্বে পেনসন গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁহাকে কলিকাতায় কয়েক বৎসর ইন্‌টার্ন (Intern) করা হয়। বহুকাল তাঁহাকে নজরবন্দী-অবস্থায় কাটাইতে হয়। সেই সময় তিনি লাভলক স্ট্রীটে বাস করেন এবং লেখকের নিকট বলেন, রাতদিন ছায়ার মত সি আই ডি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। এমন কি তাঁহার কন্যা সুনলিনী ও জামাতা—কটকের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার বি সি রায়ের সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে পুলিশ দেয় নাই। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তৃপ্তি ও গৌরব অনুভব করিতেন, তাহা আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন।

In the history of Indian National Congress, Dr. Aghornath's contribution should find a place in golden letters. As a scientist he was an early pioneer in Chemistry Research and like J. C. Bose and P. C. Roy infused the spirit of Research in

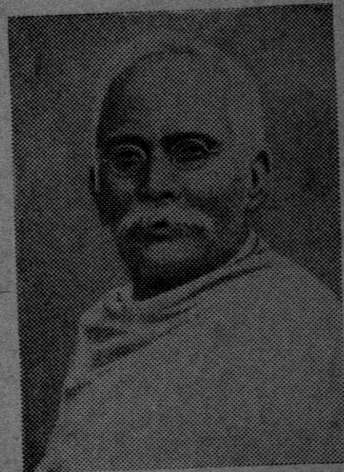
যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি



রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু



অশ্বিনী কুমার দত্ত

young scholars. His conversation had a briliancy of its own.

("Sarajine Naidu"—by Mrs. Padmini Sengupta)

এই মহান বঙ্গ সন্তানের কথা, তাঁহার প্রাণ খোলা হাসির ছটা, তাঁহার আজন্ম দেশবাসীর শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ, দেশসেবার কথা এখন লোক ভুলিয়া গিয়াছে, এখন গল্পকথায় দাঁড়াইয়াছে। লেখক তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিল দিনের পর দিন।

তিনি চিরজীবন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সত্যতে আস্থাবান মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শেষ কথা, "যাহা সত্য তাহার লীন নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কেবল আত্মাই চিরজীবী, জন্মে জন্মে ইহার স্ফুরণ ও বিকাশ হয়।"

তাঁহার কন্যা সরোজিনী বলেছেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত Asian Relation Conference in Madras-এ—"When my father Aghornath who was one of the greatest man of the world was about to die, his last words were—"Nothing can die that is good. There is no birth and there is no death. There is only the spirit seeking evolution is higher and higher stage of life."

১৯১৫ সালে লাভলক স্ট্রীটের বাসভবনে ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার তৃতীয় পুত্র রণেন্দ্রনাথ শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। তিনি তাঁহার শেষ পার্থিব কর্ম সম্পাদন করেন।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ টেলিগ্রাম পাইয়া হায়দারাবাদ থেকে সরোজিনী, সুহাসিনী ও হারীন্দ্রনাথ কলিকাতায় লাভলক স্ট্রীটের বাড়িতে আসেন। তাঁহার মা বলেন দেখ তোমাদের পিতার মৃত্যু হয় নাই, তোমাদের মাতারই মরণ হইয়াছে। চক্ষে জল নাই, স্থির এবং অনাসক্ত। তবে একদিনেই তাঁহার মাথার চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সতীসাধ্বী স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অঘোরনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যেদিন অঘোরনাথের মৃত্যু হয় সেদিন

সরোজিনীর বাটীতে হায়দারাবাদে তাঁহার "The Golden Threshold" পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার উপলক্ষে এক প্রীতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছিল। যে-মুহূর্তে অঘোরনাথ মারা যান ঠিক সেই মুহূর্তে এক ভিক্ষুণী ফটকের কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে আমি তোমাদের কাছে রুটি ভিক্ষা করিতে আসি নাই, যে আমায় অকাতরে দিত সে চলে গেছে, চলে গেছে, চলে গেছে। দাতার মৃত্যু হয়েছে।

"I shall not ask for any alms of you. He who gave generously has gone, gone, gone. The giver has gone."—("Sarajine Naidu"—Book—Page-91)

মুহূর্ত মধ্যেই সেই ভিক্ষুণী অন্তর্হিত হইয়া গেল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিস্মিত হইল, কিছুক্ষণ পরেই অঘোরনাথের মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রাম আসিল।

সকলেই স্তম্ভিত হইল ও মর্মাহত হইল।

হে বীর, হে শুদ্ধ প্রাণ, হে অমৃতস্য পুত্র—শান্তিতে বিরাজ কর।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।



স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত মনীষী বাংলার কৃষ্টি, ভাষা ও জাতীয় জীবনকে উজ্জলতর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি অন্যতম। স্যার রাজেন্দ্র—'বাঙ্গালী অব্যবসায়ী' এই কলঙ্ক মোচনকারী, প্রতিভাশালী ব্যবসায়ী, শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। তাঁহার ৮০ বৎসর পর্যন্ত কর্মময় জীবন বাঙ্গালীর মুখ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী যৌথ-কারবার ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর্ম করিতে অক্ষম, বাস্তবক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার শক্তির অভাব, এই কলঙ্ক রাজেন্দ্রনাথ নিজকর্ম, সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারা মোচন করিয়াছিলেন। তিনি একজন কর্মবীর ছিলেন। তিনি প্রথমে মার্টিন কোং, পরে মার্টিন বার্ন কোং প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য "হাউস" রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, আদব-কায়দায়, কথা-বার্তায় অফিসে ও জনগণের নিকট পুরো ইংরেজি ধরণে চলিতেন, কিন্তু অন্তরে স্নেহশীল বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্ধশতাব্দী মিশিয়া তাহা উপলব্ধি করিয়াছি।

রাজেন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখি ১৯০৫ সালে তদানীন্তন কলিকাতা শেরিফ নলিনীবিহারী সরকারের বাটীতে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ তখন বিডন স্ট্রীটের নিজ বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটী পরে বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর জে, সি, ব্যানার্জি মহাশয় ক্রয় করিয়াছিলেন। হিন্দু স্কুলের আমার সতীর্থ (ফজলী) এস, এন, সরকারের পিতা ছিলেন নলিনীবাবু। স্যার রাজেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বিডন স্ট্রীটের বাড়ি ছাড়িয়া ৭নং হ্যারিংটন স্ট্রীটস্থ প্রাসাদতুল্য নূতন বাড়িতে আসেন, তখন প্রায়ই ঐখানে আমার যাতায়াত ছিল। আমার এক আত্মীয়া

জগৎমোহিনী সিংহ ছিলেন স্যার রাজেনের প্রথমা কন্যা স্নেহলতার সহপাঠী। তাঁহার সহিত স্যার রাজেন্দ্রের ও লেডী যাদুমতী মুখার্জির সহিত মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রতি বছরই স্যার রাজেন ভাইস্‌রয়কে পার্টি দিতেন। এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাইলাম।

এইরূপে জগৎমোহিনী দেবীর মাধ্যমে লেডী যাদুমতীর সহিত পরিচয় লাভ করি। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। প্রতি উৎসবে তিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আহ্বান করিতেন। মদীয় আলয়ে পূজা ও বিবাহ উপলক্ষে লেডী মুখার্জি যোগ দিতেন।

একবছর পদ্মপুকুরে চড়ক উৎসবের সহিত একটি স্বদেশী দ্রব্যর মেলা করা হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে পৌড়াবাজারে, অধুনা যে স্থানে Calcutta Club-এর গৃহনির্মিত সেইখানে এক বিরাট স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা জে, চৌধুরী সাহেবের চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গরূপে এই স্বদেশী প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাহার পরেই কলিকাতায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী পদ্মপুকুরের চড়ক মেলার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও সহ-সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়, আর সম্পাদকের ভার ছিল লেখকের উপর। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন স্যার পি, সি, রায়। প্রদর্শনী দেখিবার জন্য লেডী যাদুমতী মুখার্জিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনি। লেডী মুখার্জি এই প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। তিনি শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রকে প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পাঠান।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর চারিধারে পদ্মপুকুরের চারিদিকে চড়কের মেলা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়া লেডী মুখার্জিকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "কুলো-ধামা আর পাঁপরভাজার প্রদর্শনী দেখাতে আমায় পাঠিয়ে আমার সময় নষ্ট করলে।"

তখন যাদুমতী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "চড়কের মেলার উত্তরে বিরাট স্বদেশী মেলার প্রদর্শনী ক্ষেত্র।"

তখনই আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়া প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি সব সংবাদ লইলেন। প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে তখন। কিন্তু স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্য সাউথ সুবার্বন স্কুল

হলে প্রদর্শনীর প্রদর্শকদের সার্টিফিকেট বিতরণী সভায় নিজহস্তে বিতরণ করেন।

এইরূপ মনোভাব থাকায় ঊনবিংশ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন গোখেল মেমোরিয়াল ইস্কুলের নবনির্মিত হর্ম্যে যখন একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়; তখন সেই প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের সহিত গিয়া স্যার রাজেন্দ্রকে অনুরোধ করি। তিনি একবাক্যে 'তথাস্তু' বলিলেন। তিনি প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করিতে আসিলে তখন তাঁহাকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি। তিনি হাসিয়া সম্মত হন। বাংলা টাইপকরা লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, শুধু তাই নয় কালো আলপাকার কোট ও ধুতি চাদর পরিয়া সভায় আসেন। এইরূপ পোষাকে তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহাকে এই পোষাকে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হন। মনে আছে অনভ্যাসের দরুণ তাঁহার কাপড় খুলিয়া যাইতে লাগিল, তখন এক বেল্ট কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

তিনি অতি সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। জাল, জুয়াচ্চুরী বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা ঠিক করিতেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহার দূরদৃষ্টির খুব খ্যাতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১ কি ১৯২২ খৃস্টাব্দে ভারতে দারুণ অর্থকষ্ট হয়। সেই সময় মার্টিন কোং-এর এক প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ারকে তিনি ছাড়াইয়া দেন। সেই ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় আমার প্রতিবেশী ছিলেন। স্যার রাজেন্দ্রনাথ যাহাতে পুনর্নিয়োগ করেন তাহার জন্য আমাকে কাতরভাবে অনুরোধ করেন। আমি কখনও স্যার রাজেন্দ্রের নিকট কোন কারণেই তাঁহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হই নাই। কোন বড়লোকের কাছে নিজের স্বার্থের ও সুবিধার জন্য অনুগ্রহ চাওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণের কাতরতা এড়াইতে না পারিয়া স্যার রাজেন্দ্রনাথকে ঐ ইঞ্জিনীয়ারের পুনর্নিয়োগের কথা বলি।

তিনি বিরক্ত না হইয়া বলিলেন—"আমার কর্মচারীকে ছাড়াতে কি আমার ব্যথা লাগে না? বড় দুর্দিন আসছে—তাই ছাড়িয়েছি। তুমি দেখো ২।১ মাসের মধ্যে ক্লাইভ স্ট্রীটে লোক চলবে না।"

ঠিক তাহাই হইল। ক্লাইভ স্ট্রীটের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির পরম ভক্ত ছিলেন। ইংরেজ আইনের পরম অনুরাগী, তথাপি তাঁহার অন্তর স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছায় ভরিয়া থাকিত। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবার পাই। লেডী অবলা বসুর প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ। একবার এক কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় লেডী বসু নারী-শিক্ষা সমিতির বিদ্যাসাগর বাণীভবনের তত্ত্বাবধায়িকা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (কাকুলী) ষড়যন্ত্র মামলার অর্থসংগ্রহ করিবার অপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার সংকল্প করেন। তখন আমাদের প্রস্তাবমত শ্রীমতী গাঙ্গুলীর শাস্তিবিধান করিলেন না ও লেডী বসুর প্রস্তাব নাকচ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "মিস্ গাঙ্গুলী ব্যক্তিগত অধিকারে যদি রাজনৈতিক মামলার জন্য অর্থসংগ্রহ করেন তাহাতে বাধা দেওয়া অনুচিত, আর দেশের স্বাধীনতার জন্য। যাঁহারা শক্তি ও অর্থ ব্যয় করেন তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ।

তিনি অতি নিষ্ঠাবান গৃহস্বামী ছিলেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে যেমন কড়া শাসন ছিল তেমনই ছিল স্নেহপ্রবণতা ও সংঘবদ্ধতা। তাঁহার জিতেন্দ্রনাথ ও স্যার বীরেন্দ্রনাথ নামে দুই পুত্র এবং স্নেহ, মায়া, প্রীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম পাঁচ কন্যা মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবার সময় সকলে সমবেত হইতেন।

লেডী যাদুমতী ধর্মপরায়ণা ও সাধ্বী মহিলা। একদিন স্যার রাজেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বলেন, "একটি ভালঘরের বামুনের মেয়ে দেখিয়া দাও। আমার ছোটছেলের (স্যার বীরেননাথের) বিবাহ দিব।"

আমি ইঙ্গিত করিলাম, "গৃহস্থের মেয়ে যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমার জানা এক মেয়ে আছে। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর মেয়ে—রাণু। রূপসী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী।"

রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তুমি এখনই কবিকে খবর দাও।"

রাণুর সহিতই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বিবাহের জন্য কন্যা-পক্ষের বাটী ঠিক করিবার ভার পড়িল আমারই উপর। ২৬ নং

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিকের বাগান-বাটী—"যাহার বক্ষভেদ করিয়া রিচিরোড গিয়াছে। অধুনা সেন্ট লরেন্স স্কুলের অট্টালিকা দাঁড়াইয়া আছে।" সেই বাটী জোগাড় করা গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কয়েক ঘণ্টা তথায় ছিলেন। হিন্দুমতেই বিবাহ হয়। ফণীবাবুর প্রথমা কন্যা আশা এখন (মিসেস্ আর্যনায়ক) তাহার পর ভক্তি, মুক্তি, শক্তি সকলেই বিদুষী এবং আমাদের পরিচিত। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আমার এক মাতুল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রগণের ইহারা সহপাঠী। ভবানীপুরের হেলাম্ রোডে ফণী অধিকারী মহাশয় যখন বাস করিতেন তখন প্রায়ই মদীয় ভবনে আগমন করিতেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ কোন মোটা দান করিয়া যান নাই বটে, তবে মাসে ৭।৮ হাজার টাকা দান করিতেন বলিয়া আমার জানা আছে। এই দানের মধ্যে ইনি তাঁহার স্বগ্রাম ভাবলার বাটীর আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও পরিধানের জন্য ব্যয় করিতেন।

তবে তিনি দানের অপব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা আমাদের পাড়ায় ভ্যানা মিত্র মহাশয়ের পুত্র চাঁদার খাতায় মৃত বা ভারতে অনুপস্থিত ইংরেজ দাতার নাম লিখিয়া স্যার রাজেন্দ্রনাথের নিকট ফুটবল ক্লাবের চাঁদার জন্য এক খাতা উপস্থিত করেন। স্যার রাজেনের অনেকে দুর্নাম দিত যে তিনি বড়ই সাহেব-ঘেঁষা। তিনি মিথ্যা নাম বসানো ধরিয়া ফেলেন এবং তিনি তাঁহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া দেন। ঐ যুবকের ৬ মাস জেল হয়।

স্যার রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার G. P. O-র সামনে লালদীঘির পশ্চিমে। ইহা প্রাক্-স্বাধীনতা দিবসে লালদীঘির বাগানে প্রথম ভারতীয় মূর্তি স্থাপন। ৫।৬ বৎসর পূর্বে ট্রাম লাইন প্রসারের জন্য সেই মূর্তি ডালহাউসি স্কোয়ার হইতে অপসারিত হইয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে বসানো হইয়াছে। ইহার কারণ মার্টিন কোং ভিক্টোরিয়া হলের নির্মাতা। তবে ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথের মূর্তি কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী অঞ্চলে লালদীঘির পাড়ে এই মূর্তি স্থাপিত হওয়াই সমীচীন।

আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পৃহা ভারতীয়দের মধ্যে খুবই জাগিয়াছে। স্যার রাজেন্দ্রনাথের পূত-চরিত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সততা, অভিজ্ঞতা এবং নিষ্কলঙ্ক আদর্শ আধুনিক ব্যবসায়িগণকে কোনপ্রকারে অসাধুতার হাত হইতে রক্ষা করিলেই বাংলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

অনাগরিক ধর্মপাল

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে আমেরিকায় সিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই মহাসভায় এশিয়ার দুইজন সাধু যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এশিয়ার দুইটি মহাধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্ব ও দর্শনের গুহ্যতত্ত্ব বিশ্ববাসীর নিকট পরিবেশন করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন অনাগরিক ধর্মপাল। জড়জগতের উপর আধিপত্য এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত চঞ্চল মনোবৃত্তির নর-নারীগণ ভারতেরই মহামানব ভগবান বুদ্ধের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ধর্মপালের নিকট শুনেন। ধর্মপাল মহাশয় বিশ্ববাসীর সমক্ষে সহজ ও সরল কথায় বুদ্ধের বাণী প্রকাশ করেন। মানব নিজেই তার সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা এই গৌরব পাইল।

ধর্মপাল সিংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিংহল দ্বীপেই তাঁহার বাল্য-জীবন ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ ১৪শে সেপ্টেম্বর সিংহলের ধনি হেওবতরণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষেরা খৃস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধর্মপাল মহাশয় বিখ্যাত থিওজফিস্ট ম্যাডাম ব্লেভাস্কি ও কর্নেল অলকট সাহেবের সর্ব ধর্ম গুহ্য তত্ত্বকথা পাঠ করিয়া তাঁহাদের অনুরাগী হন। বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা বুঝিতে পারেন ও বৌদ্ধ দর্শনে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তদবধি তিনি বুদ্ধের পরম অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন এবং থিওজফিস্ট নীলকমল মুখার্জি মহাশয়ের অতিথি হইয়া থাকেন। তাহা ১৮৯১ সালের ঘটনা। তিনি বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা দেশকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র কলিকাতা ছিল। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম ভারতে চার বৌদ্ধস্থান প্রবর্তনের ব্রতর প্রধান ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মুখার্জি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি—মহাবোধি সোসাইটির সভাপতিরূপে। (লেখকের লিখিত চার

পুণ্যস্থান পুস্তক লিখিত আছে)। ১৮৯৩ সালে কলিকাতায় হেড-কোয়ার্টার করিয়া "মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া" স্থাপনা করেন। এবং তিনি বেনিয়াপুকুর লেনে ৩৮ নং ভবন নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন, সে বাটি এখনও মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ধর্মপাল মহাশয়ের মানসপুত্র অধিকার করিতেছেন।

নানা বাধা, বিঘ্ন, অসুবিধা, নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি বুদ্ধের লীলাস্থানগুলি প্রকট করিবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের প্রধান চারটি স্মরণীয় স্থান লুম্বিনী (জন্মস্থান), বুদ্ধগয়া (বোধিত্ব প্রাপ্তস্থান), সারনাথ (ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান) ও কুশীনারা (পরিনির্বাণ স্থান) পুনরায় তীর্থস্থানে পরিণত করেন। (মৎ প্রণীত 'চার পুণ্য স্থান' গ্রন্থে বর্ণিত আছে)।

১৯২০ খৃস্টাব্দে মহাবোধি সোসাইটি আইনত রেজিস্ট্রী করা হয়। তিনি তাঁহার সিংহলস্থ সম্পত্তি বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতে মহাবোধি সোসাইটির পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। সেই উইলের ও অছির সর্ত পাঠ করিয়া ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, তিনি ভারতবর্ষকে তাঁহারই জন্মভূমি তুল্যই পুণ্য ও প্রিয় ভূমি অনুভব করিতেন। তিনি প্রায় ৪৫ বৎসর ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও নীতি পুনঃপ্রচলনের জন্য চিত্ত ও বিত্ত নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

নিজে আচরিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন, তাই তিনি ১৯৩১ সালে বৌদ্ধভিক্ষু হন। তাঁহার আমরণ ইচ্ছা ছিল সিংহলে জন্ম করিযাছেন বটে, ভারতবর্ষ তাঁহার দ্বিতীয় জন্মভূমি, সেখানেই যেন তাঁহার নির্বাণ হয়। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৩৩ সালে সারনাথে তিনি দেহরক্ষা করেন।

এই মহাত্মাকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য হয় আমার মাতুল নগেন্দ্রনাথ বসু (বেঙ্গল থিওজপিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক) মহাশয়ের ২১।২ বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাদুড় বাগানের বাটীতে। তখন সেখানে মিসেস্ এ্যানি বেসেণ্ট অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্মপাল মহাশয়কে দেখিবার ও তাঁহার স্নেহ পাইবার সুযোগ পাই। ইহা ৬০ বৎসর পূর্বের কথা, তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, ইন্দুসম ললাট, সহাস্য-সৌম্য মূর্তি আমাকে আকৃষ্ট করে।

তখন আমি হিন্দু স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ি ও মাতুলালয়ে থাকিতাম।

ধর্মপাল মহাশয় মাতুল নগেন্দ্রনাথবাবুর সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। নগেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের সহিতও আত্মীয় ভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালের কথা। তাঁহার ইচ্ছা হয় বুদ্ধেরই দেশের এক বাঙ্গালীর ছেলেকে তাঁহার মানস-পুত্র করিয়া গড়িয়া তোলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নগেন্দ্রবাবুর এক নাতিকে দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর সম্মতি থাকিলেও সন্তানের জননীর আপত্তিতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তৎপরে তিনি সিংহলী দেবপ্রিয় বলি সিংহকে দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। দেবপ্রিয়কে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রাখিয়া বাংলা শিখান, ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপযুক্ত বাহক করিয়া শিক্ষা দেন। আজন্ম লালন-পালন করিয়া মহাবোধি সোসাইটির পরিচালক করিয়া যান।

ধর্মপাল মহাশয়ের সহিত দ্বিতীয়বার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসি যখন কলেজ স্কোয়ারে ধর্মরাজিকা বিহার নির্মাণ হইতেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ মম সহকর্মী মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় এই বিহারের নক্সা প্রস্তুত ও পরিদর্শন করিতেন। এই বিহারের সম্মুখভাগের (faced and elevation , পরিকল্পনা অজন্তার ১১নং গুহার বাতায়নের অনুকরণে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইতেছিল। তখন লেখক মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত এই বিহার নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করিতেন।

সেই সময় দেখিয়াছিলাম প্রতি ইট, পাথর বসাইবার সময় কত যত্ন, কত আগ্রহ এই সাধু প্রকাশ করিতেন। এমন কি মৎ তুল্য তরুণ ব্যক্তির মতামত ধীর ও স্থির চিত্তে শুনিতেন। যেমন বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা মন-প্রাণ-সাধনা দিয়া অজন্তার গুহাগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন; তেমনই সাধু ধর্মপাল কলেজ স্কোয়ার ধর্মরাজিকা বিহারটি গঠনে ও আরাধ্যদেব ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপনে মন-প্রাণ-সাধনা প্রয়োগ করিয়া অমর হইলেন।

তারপর অনেক অনুষ্ঠানে, উৎসবে ধর্মপালের সহিত মিলিবার ও তাঁহার সেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। বিহার নির্মাণ শেষ হইলে রেভাঃ ধর্মপাল এই বিহারে বুদ্ধ-অস্থি ও মূর্তি স্থাপন করিবার জন্য

উদগ্রীব হইলেন। তখন মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার পরিচালনার জন্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি মহাশয়কে পাইয়াছিলেন। এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, এই সময় তৃতীয়বার ধর্মপাল মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসি। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বাঙ্গলার গভর্নর নাগার্জুন কুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধ-অস্থি ভারত সরকারের পক্ষে মহাবোধি সোসাইটিকে তাহার প্রেসিডেন্ট স্যার আশুতোষের হস্তে প্রদান করেন। সেই অস্থি এক বর্ণাঢ্য মিছিলে গভর্নমেণ্ট হাউস হইতে কলেজ স্কোয়ারের ধর্মরাজিকা বিহারে আনীত হয়।

এই ঐতিহাসিক মিছিলের পুরোভাগে নগ্নপদে আসিতেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ-পার্শ্বে ধর্মপাল ও বাম-পার্শ্বে মিসেস্ অ্যানি বেসেণ্ট। তাঁহাদের পশ্চাতে আমারও আসিবার পুণ্য হইয়াছিল। এই মিছিলের সুমোহন তৈলচিত্র এখনও আশুতোষ কলেজ গৃহে শোভা পাইতেছে। দেখিলাম জয় ও তৃপ্তিতে ধর্মপালের সর্বাঙ্গ এক মহান জ্যোতিতে ভরিয়া আছে।

বুদ্ধের লীলাক্ষেত্রগুলিতে বিহার, সংঘারাম ও স্তম্ভ স্থাপনে ধর্মপালের আগ্রহ আজীবনকাল দেখা যায়। তিনি মেরী যাবটার নামক বিদেশী মহিলার—সারনাথে যেস্থানে প্রাচীন মূলগন্ধকুটী বিহার রাজা অশোক নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারই ধ্বংস্তূপের উপর নতুন সুদৃশ্য বিহার নির্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন। পরিণতবয়সে বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, এই মূলগন্ধকুটী বিহার নির্মাণের কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। একদা তাঁহার সহিত সারনাথে এই বিহার গঠনের সময় সাক্ষাৎ হয়। তখন সারনাথের প্রাচীন মূলগন্ধকুটীর ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত ভূমিস্পর্শমুদ্রার অপূর্বমূর্তির অনুকরণে এক মনোরম মূর্তি খোদাই হইতেছিল। আমার নিকট ঐ মূর্তির একখানি প্রামাণিক ফটো-প্রিণ্ট ছিল। তাহা ধর্মপাল মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি অতি আগ্রহের সহিত মূর্তির খোদাই-কার্য মিলাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তিনি আমাকে এই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চক্ষু যাহাতে প্রাচীন মূর্তির মতন ঠিক ঠিক খোদাই হয় তাহা দেখিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। এবং প্রতিদিন একাগাড়ি পাঠাইয়া কাশীর চৌখাম্বা মহলায় মদীয় শ্বশুরালয় (রাজা রাজেন্দ্র মিত্র ভবন) হইতে

আনাইতেন। স্নেহভরে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া মূর্তি খোদাই পরিচালনা করিতেন। এইরূপ নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অতি বিরল।

তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে বুদ্ধের জন্ম ও লীলাভূমি ভারতে বিশেষত তাঁহার ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথে দেহরক্ষা করিবেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শতবার্ষিকী জন্ম-উৎসবের বছর সেই সমাধিস্থানে একটি মণ্ডপ ও মর্মরমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার মর্মরমূর্তি স্থাপিত হইবে। ইহার পাদপীঠের ভিত্তি ১৯৬৬ সালে বাঙ্গলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ-ভাষা প্রসার সমিতির আন্তর্জাতিক চিত্রশালায় বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, রাণী এলিজাবেথ, জাপান ও ইউরোপীয় সম্রাটদ্বয়ের, প্রেসিডেন্ট জনসন ও কেনেডির, বেলজিয়ামের রাজা, নেপালের রাজা মহেন্দ্রর চিত্রের সহিত ধর্মপাল মহোদয়ের চিত্র (মহাবোধি সোসাইটি প্রদত্ত) স্থাপিত হইয়াছে। যুগে যুগে এইরূপ ধর্মসংস্থাপনের জন্য মহাপুরুষদের অবির্ভাব প্রার্থনা করি।

১৯৬৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ভারতবাসীরা সরকার ও জনসাধারণ অনাগরিক রেভাঃ ধর্মপালের শতবার্ষিক জীবনী উৎসব পালন করিতেছে। এই ভারতপ্রেমী বৌদ্ধাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আমরা বাঙ্গালী ও ভারতের নর নারী ধন্য হইলাম। নমঃ বুদ্ধায় নমঃ।

———

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে নানা চিন্তাধারার স্রষ্টা এত অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে একই যুগে জন্মায় নাই। আমরা ১৮১৭ খৃঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৮২০ খৃঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ১৮২৫ খৃঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৮৩০ খৃঃ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, ১৮৩৮ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেন, ১৮৪০খৃঃ কালীপ্রসন্ন ১৮৫৮ খৃঃ জগদীশচন্দ্র বসু, ১৮৬১ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৮৬২ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৬৩ খৃঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৮৬৫ খৃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাইয়াছি।

অবশ্য যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ও যুগ-অবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্যাপ্ত ছিল। এই নববঙ্গ গঠনের যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম এবং কর্ম হইয়াছিল।

বঙ্গের বাঁকুড়া জিলায় তাঁহার জন্ম হয় ১৮৬৫ খৃঃ ৩১শে মে তারিখে। তিনি ৬০ বৎসর লেখনী চালনা করিয়া ভারতের শিক্ষা, সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রচেতনা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মাতৃভাষা অনুরাগিতার যে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত এবং তাঁহার গুণকীর্তন করা আমাদের মতন স্বল্প মেধাবীদের ধৃষ্টতামাত্র। তাঁহার সৃজনীশক্তির ও লেখার তীব্রতা ও স্বাধীন নির্ভীকতা সম্বন্ধে কয়েকটি মনীষীর অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সংস্রবে আসিয়া যে পুণ্য অর্জন করিয়াছি তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব।

তাঁহার আত্মপ্রচার বাসনা এমনই দমিত ছিল যে তিনি কখনও তাঁহার প্রবাসী, মডার্ন রিভিউকে ছাড়াইয়া নিজেকে বড় হইতে দেন নাই। সেইজন্য জগদ্বিখ্যাত সাংবাদিক Sunderland সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"Is there any man who during last fifty years has done more for educational, social, moral, political uplift of India than Ramananda Chatterjee."

বিদেশী শাসকদের হাতে যখন Father of India Nationalism রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (Surrendernot Banerjee) নিগৃহীত হন এবং যখন তাঁহার জেলে যাইবার হুকুম হইল তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যে খুব আন্দোলন হয়, তাহার মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী ও রামানন্দ চ্যাটার্জী—তাই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার Nat'on in making আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"One of these rowdy youths was Sir Asutosh Mukherjee and other was Ramananda Chatterjee."

যখন রামানন্দবাবু সিটি কলেজের অধ্যাপক তখন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

মন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা, কবিতা ও গানের বিকাশ প্রবাসীর পাতায় পাতায় বিকশিত হইয়াছিল তেমনই আধুনিক প্রাচ্য শিল্পীর চিত্র প্রকাশ ও প্রচার নির্ভীকভাবে প্রবাসীর পাতায় পাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তাই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর জয়ন্তীতে লিখিয়াছেন—

"নতুন বাঙ্গলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁহার আলবাম তাঁহার রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকদের হাতে তাঁহাকে ›রস্কৃত হইতে হইয়াছে, আর আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁহার দৌলতে বিনা পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো।"

রামানন্দবাবু যে-যুগে লেখনী সঞ্চালন করিতেছিলেন সেই সময় বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ভারতে বিস্তারলাভ করে নাই। রামানন্দবাবুর দৌলতেই বিজ্ঞানে তথ্য প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পাতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের নূতন নূতন আবিষ্কার, লতাপাতার ছেদনের অনুভূতি আমরা জানি প্রবাসী পাঠ করিয়া। সেইজন্য প্রবাসীর পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হইলে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু রামানন্দবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি প্রকৃত মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ

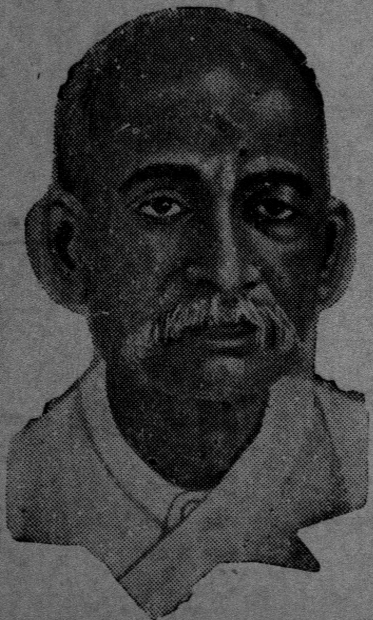
করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ।"

রামানন্দ জাত-সাংবাদিক ছিলেন—তিনি এ বিষয়ে চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। তিনি ১৮৯২ খৃস্টাব্দে 'দাসী', ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে 'প্রদীপ' সম্পাদনা করিয়া যশস্বী হন। ১৮৯৫ সালে কায়স্থ পাঠশালায় প্রিন্সিপ্যাল হইয়া এলাহাবাদ প্রবাসী হন। তাই ১৯০১ খৃস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করেন। আজও সেই প্রবাসী তাঁহারই মত ও পথ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যে ও সাংবাদিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মডার্ন রিভিউ প্রকাশ করেন ১৯০৭ খৃস্টাব্দে।

রামানন্দ সংস্পর্শে

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেই সময় খাস এলাহাবাদ শহরে বাহাদুরগঞ্জে মদীয় আত্মীয় মেজর ডাক্তার বামনদাস বসুর বাড়িতে প্রথম রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রকাণ্ড হলগৃহে রামানন্দ, কেদারবাবু, অশোকবাবু, শান্তা দেবী ও সীতা দেবীদের সহিত অবস্থান করি। সৌম্য ও স্বল্পভাষী রামানন্দবাবুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। তখন কেদারবাবুর বয়স ১৯।২০ এবং অশোকবাবুর বয়স ১১ বৎসর। তারপর রামানন্দবাবুর সহিত বহুবার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের মঞ্চোপরি এবং তাঁহার বক্তৃতা আসরে আলাপ-পরিচয় হয়। বঙ্গভাষার প্রতি মমত্ববোধের অনুপ্রেরণা পাই তাঁহারই নিকট।

যখন গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন অতুলপ্রসাদ সেনের সভাপতিত্বে হয়, তখন তাঁহার এই সম্মেলনের সহিত বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতররূপে সংযুক্ত ও পরিচিত করিবার ইচ্ছা হয়। যখন দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করিবার প্রস্তাব হয়, তখন তাঁহার চিত্ত অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়, যখন কলিকাতায় অধিবেশনের কথা শুনিয়া বিরোধিতা ও ঠাট্টা সুরু হইল তখন তাঁহার সেই সৌম্যবদন ক্ষণিকের তরে বিচলিত হইয়াছিল। বিরোধীদল ইহা 'সোনার পাথরবাটি প্রস্তুত হইবে' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। তিনি তখন নির্ভীক



সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল



গোপালকৃষ্ণ গোখেল



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

চিত্তে বসিয়া তাহার মনন করিতেছিলেন। যখন বার বৎসর বাদে জন্মস্থান দর্শন করা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইল এবং অতুলপ্রসাদ তাহা অনুমোদন করিলেন, তখন রামানন্দবাবুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

এই সম্মেলন কলিকাতায় টাউন হলে যখন অনুষ্ঠিত করিয়া পরিশ্রম করিবার আশ্বাস তাঁহকে দিলাম, তখন তিনি অপার স্নেহে শুভেচ্ছা জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হইলেন। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন (কেবল মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী বাহির হইবার আগের সাত দিন ব্যতীত) আমার সহিত সাধারণ কর্মীর ন্যায় কাজ করিয়া যাইতেন।

এই সময় তাঁহার নীতি রক্ষার অপূর্ব দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া মুগ্ধ ও আশ্চর্য হইয়াছিলাম। এই সম্মেলনে দ্বাদশটি শাখার অধিবেশন হয়। তাহাদের উদ্বোধক ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ এক একটি মনীষী এবং সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গের বাহিরের প্রবাসের কোন না কোন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। যেমন মূল সভাপতি হন এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি লালগোপাল মুখার্জী, আর উদ্বোধন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। বিজ্ঞানের সভাপতি হন সিংহলপ্রবাসী ডা: ভানুদাস গুপ্ত, আর উদ্বোধন করেন স্যার জগদীশচন্দ্র। সাহিত্যে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি, উদ্বোধক প্রমথ চৌধুরী, মহিলা শাখায় সভানেত্রী দিল্লীর শ্রীমতী সেন,—উদ্বোধন করেন লেডী অবলা বসু।

তখন তরুণ ও তরুণীর দল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন অংশগ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা না হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হন, এমন কি অসহযোগীতার হুমকী দেখান। তখন তিনি দৃঢ়চিত্তে 'চরিত্রহীনের' লেখককে এই সম্মেলনে আহ্বান করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। আবার যখন সম্মেলনের মহা বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অনুরূপা দেবীর মতের বিরুদ্ধে তিনি শরৎচন্দ্রকে শেষ দিনে বৈঠকপতি করিয়া আপ্যায়িত করিবার মদীয় প্রস্তাব সমর্থন করেন, এইরূপই ছিল তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ভীকতা।

তিনি প্রদীপ, প্রবাসী, ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ৫০ বৎসরের

অধিক সময় বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যের কথা ভারতে ও বিশ্বে নানা যুক্তি, উদাহরণ দিয়া ব্যক্ত ও প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয় যখনই যে পরামর্শ, Statics, যুক্তি জানিতে চাহিয়াছি তাহা অকুণ্ঠচিত্তে দিয়াছেন। যখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানী (সংস্কৃত-ফার্সী মিশ্রিত নূতন ভাষা) স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

সেই অনুষ্ঠানে যখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন 'মাথা নাই ত' মাথাব্যথা, রাষ্ট্র নাই ত রাষ্ট্রভাষা' বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তখন রামানন্দবাবু যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া "ভারতে রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বাঙ্গলা ভাষা"—এই দাবী আমার সহিত উত্থাপন করেন এবং নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি স্থাপনা করিবার প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। (১৯শে মাঘ ১৩৪৫) এই সমিতির সম্পাদক এই লেখক নির্বাচিত হন এবং রামানন্দবাবু ইহার সহ-সভাপতির পদ সানন্দে গ্রহণ করেন; আমরণ উক্ত সমিতিকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এমনই ছিল তাঁর বাঙ্গলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার ওপ্রসারের সাধনা।

———

সরোজিনী নাইডু

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারী। তাঁহার পিতা জগতবিখ্যাত রসায়নবিদ ও শিক্ষাদানব্রতী ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডি-এস-সি এডিনবরা, আর তাঁহার মাতা ছিলেন বরদা সুন্দরী বাংলা গীতি কবি ও সুগায়িকা। সরোজিনী অতিশয় পিতৃমাতৃ ভক্তি পরায়ণা রমণী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা, গার্হস্থ জীবন, কাব্য রচনা ও রাজনৈতিক লীলা ক্ষেত্র সবই হায়দরাবাদে তাহার পিতৃ ও স্বামীগৃহে অতিবাহিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদের পরই তাঁহার জীবনের অনেক সময় বাংলা দেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবন লাভলক্ স্ট্রীটে অতিবাহিত করেন। সরোজিনী পিতা ও মাতার জন্মভূমি বাংলাকে খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু কলিকাতায় ছিল। সেই সময় বহুবার সরোজীনী দেবীর সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল।

আমাদের বাড়ীর খুব নিকটেই লাভ্‌লক্ স্ট্রীট। মদীয় ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডের বাটী হইতে দু' মিনিটের পথ। তিনি প্রত্যহ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে প্রাক্তন ভাইসরয় বডিগার্ড লাইনের ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া আমাদের রকের উপর বসিতেন। এবং তাহার পুত্র-কন্যার বিষয়, হায়দরাবাদের নানা গল্প ও কাহিনী বলিতেন। সরোজিনীর বাল্য-শিক্ষা, গার্হস্থ জীবনের বিবরণ শুনাইতেন। সেইজন্য সরোজিনী দেবীকে প্রায় ২০ বৎসর হইতে জানিতাম ও তাঁর সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তাঁহাকে প্রথম দেখি ১৯০৬ সালে পোড়াবাজারে তদানীন্তন জলের কলের ত্যক্ত ময়দানে। তিনি সেদিন কংগ্রেস মণ্ডপে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ বাবু ও আমি ছিলাম প্যাণ্ডেলের স্বেচ্ছাসেবক। আমার

উপর ভার ছিল গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সেবার। আমরা দুইজনই তিন দিন ধরিয়া তদানীন্তন দেশ নায়কদের সহিত মেলামেশা ও তাঁদের আলোচনা ও ভাষণ শুনিবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সেবার কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় এম-পি দাদাভাই নরোজি। এই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। সেজন্য আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম স্যার ফিরোজ সা মেটা, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎরায়, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়দের বক্তৃতা। সেইসময় হইতে মডারেট অর্থ নরম পন্থী ও একস্ট্রীমিস্ট বা চরমপন্থীগণের উদ্ভব হয়। সরোজিনী নাইডু সেইসময় বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

সরোজিনী রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে যখন সরোজিনী উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল, তখন শান্তিনিকেতনে যাইতেন। এবং শান্তিনিকেতন পরিচালন মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৮ সালে তিনি শেষবার শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন এবং উত্তরায়নে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মধ্যাহ্নভোজন করেন।

সরোজিনী তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা লিখিতে পড়িতে এমনকি বলিতেও পারিতেন না। কেবল বুঝিতে পারিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক বই-এর ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। তাই ডাঃ বি সি রায় সরোজিনীকে একবার বলেন, "আমার মনে বড় দুঃখ হয় যখন কোন বঙ্গসন্তান রবিঠাকুরের গান ও কবিতা বাংলাভাষায় পড়ে না।" তিনি সরোজিনীকে বাংলা না জানার জন্য তিরস্কার করেন। ঠিক এইরূপ তিরস্কার একবার আমারই সামনে পণ্ডিত নেহেরুজী বাংলার রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুকে করিয়াছিলেন। সে দিন দালাইলামা কলিকাতায় আসেন, তখন তিব্বত চীনের কুক্ষিগত হয় নাই। রাজভবনে দালাইলামার সম্মানে প্রীতি সম্মেলন হইতেছে। সেই সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমায় বলেন বাংলাভাষার প্রসার কেমন চলেছে। আমি তদুত্তরে বলি বাংলাভাষা 'বে অব বেঙ্গলে' গিয়াছে। পণ্ডিতজী বলেন "তার মানে"? আমি উত্তরে বলি "কেহ বাংলাভাষা পড়ে না

কারণ তার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতরাষ্ট্রে এমনকি বাংলা রাজ্যেও ইহার ব্যবহার নাই।" তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমি কি করিতে পারি বাংলাভাষার জন্য ?" আমি বলি, "যদি আপনি অন্তত বাংলাভাষা পড়েন তাহা হইলে বাংলাভাষা অনেকে পড়িবে ও আদর করিবে।"

সেই সময় ডাঃ রায় বলেন, "তুমি পণ্ডিতজীকে নিয়ে পড়েছ কেন, আগে এঁকে অর্থাৎ রাজ্যপাল পদ্মজাকে বাংলা শেখাও।" তখন পণ্ডিতজী বলেন, "কি আশ্চর্য তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে, বাংলার রাজ্যপাল বাংলা জান না ?" তখন কুমারী পদ্মজা বাংলা শিখিতে সম্মত হন। তাহাকে বাংলা শিখাইবাব ব্যবস্থা করি। শিখাইতে যাই।

সরোজিনী বাংলা পড়িতে ও লিখিতে না জানিলেও বাংলাভাষা বুঝিতে পারিতেন, বাংলা গান শুনিতে ভালবাসিতেন। ১৯৪৮ সালে লেডী প্রতিমা মিত্র সরোজিনীর সম্মানে একটি পার্টি দেন। তখন 'আনন্দলোকে সত্য সুন্দর' গানটি শুনিয়া মুগ্ধ হন। তাঁর চোখ মুখের ভাব, গানের তালে তালে মাথা নাড়া, হাতের তাল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে তিনি বেশ রসাস্বাদ করিতেছেন।

ডঃ ভিয়েতনামের হো চি মিনকে যখন মহাবোধি বিহারের প্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা করা হয় সেদিন এই গানটিও গাওয়া হইয়াছিল। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাহা উপভোগ করেন এবং এই গানটি ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ আমার কাছে চাহিয়া লন।

সরোজিনীর রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে 'একলা চল' গানটি খুব প্রিয়।

সরোজিনী আজীবন রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইয়াছেন। কেবল তাঁর কবিতা ও গানের আদর করিতেন না। তাঁর চিত্র অঙ্কনেরও সমজদার ছিলেন। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইতে সরোজিনী ঠাকুর সপ্তাহ পালনের আয়োজন করেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শিত হয়। তিনি ছবিগুলির খুব প্রশংসা করেন। আমাব কন্যা মিশার বিবাহে আসেন।

———

অশ্বিনীকুমার দত্ত

১৯০৫ সালে বিদেশী শাসক ইংরেজগণ বাংলাদেশকে দুইভাগ করেন। বাঙ্গালীরা তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহাকে স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন Bengal Partition Agitation বলা হয়। বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম অংশের সহিত কলিকাতা তখন ভারতের রাজধানী। লর্ড কার্জন তখন ভাইসরয়। বাঙ্গালীদের চিত্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য এবং সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তখন বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বাংলার মুকুটবিহীন রাজার মত পূজিত হইতেন।

সেই যুগে পূর্ববঙ্গে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হইল। স্যার বোমফাইল্ড ফুলার পূর্ববঙ্গের গভর্ণর হইলেন। তিনি আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

১৯০৫ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। সেইসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের পত্তন হইবার আয়োজন হয়। কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের ভার অশ্বিনীকুমার দত্তর উপর ছিল এবং দেবকুমার রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন—সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভার লইয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন বসু, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তাফী ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সভায় যোগদানের জন্য বরিশাল গমন করেন। বঙ্গসাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণও গিয়াছিলেন। লেখকও সেই ডেলিগেট গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন; বয়স তখন ১৮।১৯ হইবে।

ফুলারীয় অত্যাচার তখন বরিশালে পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল।

অতিকষ্টে নানা সর্তে অশ্বিনীকুমার কনফারেন্স হইবার অনুমতি পাইলেন। তাহার মধ্যে প্রধান সর্ত ছিল কেহ বন্দেমাতরম্ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ডেলিগেটগণ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার তীরে যুক্তকরে দণ্ডায়মান। চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতেছে। মুখে অঙ্গুলি রাখিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে নিষেধ করিতেছেন। বরিশালের অগণিত যুবকবৃন্দ বন্দেমাতরম্ না বলিতে পারিয়া ক্রোধে জর্জরিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। সেই প্রথম আমি অশ্বিনীকুমার বাবুকে দেখি।

তারপর মিছিল ছত্রভঙ্গ, কনফারেন্স মণ্ডপ হইতে নেতাদের বন্দীকরণ, মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবকদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করার জন্য রক্তপাত ও জলে পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরির দৃশ্য, সুরেন্দ্রনাথের বিচার ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ এখনও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনও হইল না। বিদায়কালে পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমারের অশ্রুসজল মুখটি দেখিয়া আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের চোখও অশ্রুসিক্ত ছিল।

১৯২০ সালে পার্ক সার্কাসে জাতীয় কংগ্রেস মণ্ডপে অশ্বিনীকুমারের সহিত পুনরায় দেখা হয়। আমরা তখন অতিথি-শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক। মহাত্মাজীর সহিত নন-কোপারেশন লইয়া দেশবন্ধুর বিরোধ বাধিয়াছে। মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাবের ভোট চলিতেছে। অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের পক্ষে ভোট যোগাড় করিতেছেন। তখন অশ্বিনীকুমারের যুবকোচিত অপূর্ব তেজ, আগ্রহ ও দৃঢ়তা দেখিয়া শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ৪৩।২ চক্রবেড়িয়া নর্থ-এ বাস করেন। তাহার পর তাঁহার ভাইপো ডাঃ সুকুমার দত্ত ও ডাঃ সুশীলকুমার দত্ত ব্যারিস্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ বহুবার হইয়াছিল।

জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সাধক, অহিংসার অবতার, বুদ্ধদেবের পরমভক্ত অশ্বিনীকুমারের নিকট অনেক তথ্য জানিয়া ধন্য

হইয়াছিলাম। স্ত্রী-শিক্ষায় বাঙ্গালীকে কত আগাইয়া দিয়াছিলেন, চরিত্র গঠনে ও দেশের জন্য জীবন দিতে কত অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন, বুদ্ধদেবের রাজগৃহে অনুষ্ঠানের সময় বুদ্ধের সাধনার উৎস 'সপ্তপর্ণি' গুহার প্রকৃত স্থান নির্দেশে আগ্রহ, ব্রজমোহন কলেজের সুশিক্ষার বীজবপণে কত প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট সে সব বিবরণ শুনিয়াছি ও জানিয়াছি।

তাঁহার জন্মস্থান বাটাজোড়, সেই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ভাইভাই রূপে বাস করিত। তিনি হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত নেতা ছিলেন। আমি দেখিয়াছি ফজলুল্ হক্ সাহেব তাঁহার (অশ্বিনী কুমারের) চরণধুলি মাথায় রাখিতেন। তাঁহারই কাছে শুনিয়াছি তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ সুকুমার দত্তর স্ত্রী সাবিত্রীদেবীকে ব্রজমোহন কলেজে ছাত্রদের সহিত একত্রে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে দিয়া সহ-শিক্ষার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। নিজে আচরিয়া দেশবাসীকে ধর্ম শিখাইতেন।

তিনি বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিযোগে বুদ্ধ তাঁহার অন্যতম উপাস্য ছিলেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পীঠস্থান রাজ্যগৃহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীন নগরী রাজ্যগৃহকে পরমতীর্থস্থান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন গৃধ্রকূটই পরম বৌদ্ধ-তীর্থপীঠ। ১৯০৮ সালে মাসখানেক রাজ্যগৃহে ছিলেন। তখন তিনি পালি-গ্রন্থ পড়িতেন ও হিউ-এন-সাং-এর ভ্রমণ পুস্তক সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার গৃধ্রকূট পর্বত আবিষ্কারের কথা ডাঃ সুকুমার দত্ত আমাকে লিখিয়া পাঠান।

গৃধ্রকূট কোথায় তাহা কানিংহাম সাহেবের "এনসিয়েন্ট জিয়োগ্রাফিতে" নাই। রাজগৃহের ৫।৬ মাইল দূরে এই পর্যন্ত জানা ছিল। জ্যেঠামহাশয় একদিন প্রাতঃকালে গৃধ্রকূট গুহাস্থান নির্দেশ কল্পে এক পাণ্ডা ঠাকুরকে লইয়া এক গরুর গাড়িতে যাত্রা করেন। হিউ-এন-সাং এর নক্সা ও বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করেন যে জঙ্গলের মধ্যে এই গৃধ্রকূট অবস্থিত। ব্লকম্যান সাহেব বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্য কোন অফিসার এই গুহাতে যান নাই। পাহাড়ের শৃঙ্গ গৃধ্রর মত দেখিতে। এখনও সেখানে পূজা দেওয়ার প্রথা আছে। জ্যেঠামহাশয় এই গুহায় পূজার ফুল ও প্রদীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি যখন বার্ধক্যে রোগে কাতর, তখনও তিনি ছাপাখানা লোকের নিকট বলিয়া যাইতেন—"স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া অনেকে মনে করেন, আমার অপেক্ষা কেহ উচ্চ নাই। কিন্তু গণ্ডীর বাহির হইলে দেখিতে পান, তাহা অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির অন্ত নাই। গ্রামে যিনি আপনাকে উচ্চ মনে করেন সহরে আসিলে তাহার উচ্চতা-জ্ঞান লোপ পায়।" তিনি এইরূপ বিনয়ী ও নির্বিকার পুরুষ ছিলেন।

অথচ সেই ভক্তিযোগের সাধনায় কত বাঙ্গালী হাসিমুখে দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

তিনি গুরু নানকের যেমন ভক্ত ছিলেন, তেমনই গুরুগোবিন্দের সাধনার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

তাঁহার মহাপ্রয়ানের সময় তাঁহার বদনে প্রফুল্লতা ও প্রশান্তভাব দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম। তাঁহার মরদেহ লইয়া সহস্র-সহস্র নরনারীর সহিত কলিকাতা কেওড়াতলা মহাশ্মশানের গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিলাম।

তাঁহার চিতাভস্ম স্থাপন করিয়া স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের রাষ্ট্রনায়কগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মহান নেতার প্রতি যথপোযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁহাকে স্মরণ করেন না।

চির বিজয়ী হও অশ্বিনীকুমার।

সমাপ্ত